হলদে বাড়ি

শ্রীনরেন্দ্র নাথ মিত্র

টি.কে. ব্যানার্জি
এণ্ড কোম্পানী

প্রকাশক
শ্রীতমস বন্দ্যোপাধ্যায়
৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
শ্রীজীবন কৃষ্ণ ঘোষ
৫নং মধুসূদন চ্যাটার্জি লেন
বেদিক প্রেস
কলিকাতা-২

প্রচ্ছদপট
শ্রীব্রহ্ম রায়

২য় সংস্করণ
ভাদ্র ১৩৬১

দাম আড়াই টাকা

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
বন্ধুবরেষু

॥ লেখকের অন্যান্য বই ॥

ছোট গল্প :

অসমতল
পতাকা
উল্টোরথ
চড়াই উৎরাই
শ্রেষ্ঠ গল্প
কাঠগোলাপ
অসবর্ণা
ধূপকাঠি

উপন্যাস :

দ্বীপপুঞ্জ
অক্ষরে অক্ষরে
দেহমন (২য় সংস্করণ)
দূরভাষিণী
সঙ্গিনী (২য় সংস্করণ)
চেনামহল (২য় সংস্করণ)
গোধূলি

যৌথ

বাড়ি থেকে বের হবার আগে অনুরূপ সন্তনির্মিত জলচৌকিখানা একাই দু'হাতে উঁচু ক'রে নিয়ে এসে ছোট ভাই স্বরূপের সামনে ফেলে দিয়ে বলল, নে বাতার চার পাশ ঘুরিয়ে লতাপাতা ফুলটুল যা পারিস ক'রে দিস। আমি যাচ্ছি হাটখোলা, আরো কিছু কাঠ নিয়ে আসতে হবে সরকারদের আড়ৎ থেকে। ওসব কুঁড়ে কাজ করবার সময় নেই আমার। শালার সাউর সখ দেখ; কালী প্রতিমার চৌকি হবে তা আবার ফ্রেমের ওপর কন্ধা না হলে চলবে না। বেশি খাটিস্‌নে, পয়সা কিন্তু বেশি দেবে না।

স্বরূপ হেসে বলল, আচ্ছা সেজন্য ভেবো না দাদা।

বাড়ি থেকে নেমে অনুরূপ হালোটের পথ ধরে। যতটা দেখা যায় অনুরূপের দ্রুত গমনভঙ্গির দিকে স্বরূপ অপলকে চেয়ে থাকে, চলমান মানুষকে কি সুন্দর দেখায়। ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে স্বরূপের। জীবনে আর কোনোদিন সে চলতে পারবে না। বহুকাল পরে আজ ক'দিন যাবৎ ক্ষোভটা আবার নতুন ক'রে জাগছে স্বরূপের। এতদিন সে যেন একথা ভুলেই ছিল। নিজের পায়ের অভাব বহুকাল তার মনে ছিল না। দাদা বৌদির অনুতপ্ত লজ্জা স্নেহ কৃতজ্ঞতা তার সমস্ত ক্ষোভকে ভুলিয়ে রেখেছিল। দাদার ব্যবহারে নিজের দুঃখের কথা মনে করতেও লজ্জা হোতো স্বরূপের। তার শোক আর অনুশোচনার

সান্ত্বনা স্বরূপকেই দিতে হোতো। এত ভেঙ্গে পড়েছিল অনুরূপ। কিন্তু দিনের পর দিন সময় বদলায়, আর বদলায় মানুষের মন। কিন্তু সময় কি সত্যই বদলায়—না মানুষের পরিবর্তনে সময় বদলানো বলে মনে হয়। আগের মত তেমনই তো দিনের পর রাত রাতের পর দিন আসছে; ঋতুর আবর্তন ঘটছে ঠিক একই নিয়মে। সামনের কৃষ্ণকলি গাছটা তেমনি বছরে একবার ফুলে ভেঙ্গে পড়ছে, ঝরে ঝরে শূন্য হয়ে যাচ্ছে গাছ; কিন্তু আবার বছর ঘুরে আসছে সেই ফুল ফোটার পালা। না সময় ঠিক এক রকমই বোধ হয় থাকে। বদলায় কেবল মানুষ—মনে আর ব্যবহারে।

কম দিন কি হোলো? সাত সাতটা বছর ঠিক একই ছোট কামরায় বন্দীভাবে কেটে গেল স্বরূপের। আরো কত সাত বছর জীবনের বাকি কে জানে। সেই দুর্ভাগ্যের দিনটা স্বরূপের স্পষ্ট মনে পড়ে। এতদিনে একটা কথাও সে বিস্মৃত হয়নি। অনুরূপের বড় ছেলে ধলুর অত্যন্ত জ্বর। তিন বছরের শিশু দুঃসহ উত্তাপে ছটফট করছে। আর পিপাসা। পৃথিবীর সমস্ত জল শুষে না নিলে তার তৃষ্ণার যেন আর নিবৃত্তি হবে না। কিন্তু ডাক্তার বলে গেছেন জল নয়, যদি দিতেই হয়, কচি ডাবের জল ফোঁটা ফোঁটা ক'রে দেওয়া যেতে পারে। গাছ তো আছে একটা নিজেদের, বেশ বড় গাছ, নারকেলও অনেক। কিন্তু নারকেল গাছে উঠবার তেমন অভ্যাস নেই। স্বরূপ ইতস্তত করছে দেখে অনুরূপ ধমক দিয়ে বলল, ছেলে যায় তৃষ্ণায় মরে আর তুই গড়িমসি করছিস। নিয়ে আয় না ডাবটা পেড়ে। ধমক খেয়ে লজ্জিতভাবে স্বরূপ গিয়ে গাছে উঠেছিল। ওঠার সময় কোনো অসুবিধাই তো হয়নি, নামার সময়ই যত বিপত্তি। তাও বেশির ভাগই তো নেমে এসেছিল। ওখান থেকে পড়ে গেলে হয়

তো তেমন কিছু হোতো না যদি ভাঙ্গা শিশি বোতলের বাক্সটা ওখানে না থাকত। বাক্সটা ঘর পরিষ্কার করার সময় অনুরূপ ওখানটায় ঠেলে রেখেছিল। আর সরিয়ে নেওয়া হয়নি। তারপর একটু একটু ক'রে কাটতে কাটতে জেলা শহরের সিভিল সার্জেন তার দুটো পায়েরই হাঁটু পর্যন্ত বাদ দিয়ে দিলেন। মাঝখানে একবার কলকাতায় অনুরূপ তাকে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখন আর সময় নেই। সেখানকার ডাক্তাররা বলেছিলেন, প্রথমেই নিয়ে এলে অন্যরকম হোতো। ধনু বেঁচে উঠেছে। আশ্চর্য তারপর থেকে তার আর কোনো কঠিন অসুখ হয়নি। আর স্বরূপও তো জীবনে মরে যায়নি। নিচের দিকটা না থাকলেও শরীরের বাকি যেটুকু আছে সেটুকু তো সুন্দর এবং স্বাস্থ্যবান। ফাঁড়াটা কারো জীবনের ওপর দিয়ে যায়নি। কেবল পায়ের ওপর দিয়ে গেছে! এর চেয়ে বড় দুর্ঘটনা তো ঘটতে পারত। একথা অনুরূপকে একদিন বলতে শুনেছে স্বরূপ। এমন কথা আগেকার দিনে অবশ্য অনুরূপ বলত না। কিন্তু মানুষ যে একই কথা চিরদিন বলবে তার কি মানে আছে? একেক সময় যদি তার একেক কথা মনে আসে তা সে বলবে বই কি।

জলচৌকিটা টেনে নিয়ে উড্‌পেনসিল দিয়ে তার পায়া আর বাতার ওপর লতাপাতার নক্সা আঁকতে লাগল স্বরূপ। পরে এগুলিকে বাটালি দিয়ে কেটে কেটে তুলতে হবে।

ভাঁড়ার থেকে কিছু ডাল নিতে এসে বারান্দা দিয়ে ঘরে ঢুকবার সময় মল্লিকা একটু থেমে দাঁড়াল। স্বরূপের কাঁধের ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হেসে বলল, ও, লতা পাতার ছবি। আমি ভাবলুম বুঝি বসে বসে কারো মুখ আঁকছ। কি মনোযোগ বাপরে বাপ! একজন মানুষ এসে গায়ের ওপর পড়লেও হুঁস হয় না। স্বরূপ বলল, হুঁস হলেই যে গায়ের ওপর থেকে মানুষটি আবার সরে যাবে। তার চেয়ে বেহুঁস থাকাই

ভালো। যেয়ো না, কেবল লতাপাতাই নয়। মুখও একখানা আঁকছি।
মল্লিকা বলল, কার মুখ।
সে কথা মুখে বলা যায় না।
আহা হা, এই ভাঙাচোরা হতকুচ্ছিৎ মুখ আঁকতে মানুষের বয়ে গেছে।
মল্লিকা হাসল।
হাসলে এখনও ভারি সুন্দর দেখায় মল্লিকাকে। অবশ্য সেই প্রথম যৌবনের রূপ আর নেই। গুটিতিনেক ছেলেমেয়ে হওয়ার পর মল্লিকার শরীর অনেক ভেঙে গেছে। মেজাজও হয়েছে খিটখিটে। তবু তার সামান্য এক আধটু হাসি-ঠাট্টার সূত্র ধরে স্বরূপের মন সেই উচ্ছল অতীতের দিনগুলিতে ফিরে যেতে চায়। কাল যেন বদলায়নি। যেন ঠিক তেমনি আগের মতই আছে মল্লিকা। স্বরূপ যেন জোর ক'রে পরিবর্তনকে ঠেকিয়ে রাখবে। মাঝে মাঝে বিরক্ত হয় মল্লিকা, কিন্তু মাঝে মাঝে আবার ভালোও লাগে। স্বরূপের ব্যবহারে কোথায় যেন একটু মোহ আছে। একটু পরে মল্লিকা বলে, যাই রান্না চড়িয়ে দিয়ে এসেছি ছোট্ট ছেলেটা কি রকম চেঁচাচ্ছে শোন, এমন অশান্তই হয়েছে ছেলেটা, তুমি কিন্তু বেশ আছ ঠাকুরপো, এসব কোনো ঝামেলা নেই।
তা ঠিক। নিচু হয়ে স্বরূপ আবার নক্সার কাজে মন দিল।
কিন্তু ছেলেটি সত্যিই ভারি চেঁচাচ্ছে, বছর খানেক মাত্র বয়স, কিন্তু সমস্ত বাড়িটা যেন ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেলবে এত আক্রোশ ওর, গলার এত তীক্ষ্ণতা।
স্বরূপ একটু বিরক্তির সুরে চেঁচিয়ে বলে, এই মিনি টেন্থু কাঁদছে কেন রে এত? শান্ত করতে পারিস না? নিয়ে যা ওখান থেকে কোলে ক'রে। মিনি অনুরূপের বড় মেয়ে, বছর পাঁচেক বয়স। সে কোথায় খেলতে বেরিয়েছে। সে এল না, তার বদলে ছেলেকে স্তন দিতে দিতে মল্লিকা

নিজেই এল, ভারি যে চটে গেছ ঠাকুরপো। স্বরূপ বলল, তোমার ছেলের জ্বালায় কি স্থির থাকবার জো আছে। ক্রমেই এক এক ডিগ্রী ওপরে উঠছে এক একজন। এটি হবে সব চেয়ে সেরা দেখে নিয়ো।

বেশ অপ্রসন্ন হোলো মল্লিকা, জোর ক'রে একটু হেসে বলল, কি করব ভাই, মেরে তো আর ফেলতে পারি না।

মনে মনে হাসল স্বরূপ। ছেলেমেয়ের বিরুদ্ধে সামান্য কিছু বললেই মল্লিকা চটে যায়। ওদের কিছু বলা মানে মল্লিকাকেই আঘাত করা। অপমান করা। ছেলেমেয়ের সঙ্গে এত একাত্ম হয়ে গেছে মল্লিকা। তাকে যদি ভালোবাসতে হয়, শুধু তার দোষ ত্রুটিগুলিকেই নয়, তার সন্তানদের দোষ ত্রুটি শুদ্ধ ভালবাসতে হবে।

স্বরূপ জবাব দিল, না, মেরে ফেলবার দরকার হয় না, শান্ত করতে পারলেই হয়।

মল্লিকার মুখ কঠিন হয়ে গেছে, বলল শান্ত না হলে শান্ত করে কি ক'রে? বেশ, দিয়ে যাচ্ছি তোমার কাছে শান্ত কর দেখি তুমি।

স্বরূপ সত্রাসে বলল, না বৌদি মাপ কর, আমার এখানে দিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। কাজ আছে আমার।

মল্লিকা আরো ক্ষুব্ধ হোলো, কাজ আর মানুষেরও আছে। ভয় নাই ঠাকুরপো তোমার এখানে সত্যিই দিয়ে যাবো না। আমার ছেলে-মেয়েদের যে তুমি দেখতে পার না তা অত স্পষ্ট ক'রে না বললেও মানুষে বুঝতে পারে। কি করব ভাই তোমাকে সংসারী করবার চেষ্টা কি আমরা কম করেছি। কিন্তু মেয়ে দিতে কেউ রাজি হোলো না, তাছাড়া তুমি নিজেও তো একেবারে ধনুর্ভাঙ্গা পণ ক'রে বসলে আমি বিয়ে করব না।

স্বরূপ বলল, পণ না করলেই বুঝি দু'পা কাটা ছেলের কাছে কেউ মেয়ে দিত? তাছাড়া তখন ভেবেছিলাম বিয়ে করলেই তোমার সঙ্গে

ঝগড়া আরম্ভ হবে। কিন্তু না বিয়ে করলেও যে ঝগড়া বাঁধতে পারে তা তো ভাবিনি।
মল্লিকা মুখ বাঁকিয়ে বলল, নাও তুমি তো আছ কেবল তোমার রসের কথা নিয়ে। খেয়ে না খেয়ে আর তো কোনো কাজ নেই দিনরাত। বলে মুখ ঘুরিয়ে মল্লিকা চলে গেল।

বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা অনুরূপ করেছিল একথা ঠিক। কিন্তু কিছুতেই হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া স্বরূপের নিজেরও অমত ছিল। নিজেই চলতে পারে না তারপর আবার একটা বোঝা। ব্যর্থ হয়ে অনুরূপ হতাশ ম্লান মুখে বলেছিল, আমার জন্যেই তোর যত দুর্দশা। কিন্তু বিয়ে তোকে আমি দেবই। মেয়ে কি আর ভূভারতে মিলবে না? টাকা হলে বাঘের চোখ মেলে, আর তো মেয়ে। পদ্মার পারটা দেখা হয়নি। ওদিকে একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে হবে। কিন্তু আমার সংসারও তো আমার একার নয়, তোরও। সব ভার—আমার স্ত্রী-পুত্র সব তোকে আমি সঁপে দিলুম। সব তোর। সংসারের কর্তাও তুই।
একথা শুধু মুখেই নয়, কাজেও দেখাতে অনুরূপ প্রাণপণ চেষ্টা করত। সংসারের সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে সে স্বরূপের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করত। তার পরামর্শ গ্রহণও করত। হিসাবপত্র জমাখরচের খাতা তার কাছে এনে ফেলে রাখত। স্বরূপ যদি বলত, অত আমাকে দেখাচ্ছ কেন দাদা, আমি তো আর তেমন রোজগার করিনে? অনুরূপ বিস্মিত হয়ে বলত, রোজগার করিসনে মানে, আমার চেয়ে ঢের বেশি রোজগার করিস। শুধু ছুটাছুটি করি বলেই কি আমি বেশি রোজগার করি ভাবিস। আমার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা তোর, অনেক বেশি বুদ্ধি। তাছাড়া সূক্ষ্ম হাতের কাজে কেউ তোর জোড়া নেই।

কারুকার্য সত্যিই বেশ ভালো করে স্বরূপ, খাট আলমারিগুলির অলংকরণ ছাড়াও মাঝে মাঝে কাঠের উপর নানা রকম মূর্তি স্বরূপ বাটালি দিয়ে কুঁদে কুঁদে তুলেছে। নিজের চলবার শক্তি নেই বলে যেন বিশ্বের গতি-শীলতাকে সে কাঠের ওপর রূপায়িত ক'রে তুলতে চায়। এ অঞ্চলে এমন কারিগর সত্যিই আর নেই।

শুধু সাংসারিক বিষয়েই নয়, অনুরূপ নিজের স্ত্রীকেও বেশির ভাগ সময় স্বরূপের পরিচর্যায় নিযুক্ত করেছে। বলেছে, আহা, আমাকে তোমার দেখতে হবে না। আমার হাত পা আছে, নিজেরটা আমি নিজেই ক'রে নিতে পারি। ওকে তুমি একটু দেখ। ওকে একটু ফুর্তিতেই রাখতে চেষ্টা কর। আমোদ প্রমোদের আমার অভাব কি, কত খেলাধুলো বন্ধুবান্ধব আমার, কিন্তু ওর তো এখন আর সেসব কিছু নাই। ওকে যাতে তুমি খুশিতে রাখতে পার, আনন্দে রাখতে পার, তাই কর। বড় আদরের ভাই আমার। এমন ভাই কারো হয় না। আত্মোৎসর্গের প্রেরণায় মনে হয়েছে স্বরূপকে এর চেয়ে বেশি কিছু দিতে পারলে যেন অনুরূপ খুশি হোতো।

কিন্তু অনুরূপের এই দান গ্রহণ ক'রে স্বরূপের তেমন তৃপ্তি ছিল না। সে আবার মল্লিকাকে তার দাদার কাছে পাঠিয়ে দিত। বলত, যাও আর বেশি ভদ্রতা করতে হবে না। মন যে কোথায় পড়ে আছে তাতো জানি।

মল্লিকা হেসে বলত, মন কি একটা আগ্‌লা ছেঁড়া নেকড়ার পুঁটুলি যে, কোথাও ফেলে রেখে আসব। মন আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। গল্প করতে তোমারই বোধ হয় মন যাচ্ছে না। স্বরূপ গম্ভীর মুখে জবাব দিয়েছে, ঠিক বলেছ, আমি একটু অন্যমনস্কই আছি। একটা মূর্তির কথা ভাবছি। আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার।

মল্লিকা ক্ষুণ্ণ হয়ে যেতে যেতে বলেছে, সারাদিন তো তোমার ঐ এক ভাবনা, কি যে তোমার ভাব কিছু বুঝতে পারিনে।

তারপর মল্লিকা যখন স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করেছে তখন হঠাৎ স্বরূপ ডেকে বলেছে, বউদি শুনে যাও তো, জল নিয়ে এস আসবার সময় এক গ্লাস।

শুনে অনুরূপ হেসে চুপে চুপে বলেছে, জলটা তো ছল, শুনে আসাটাই বড় কথা। এবার বুঝি মান ভঞ্জনের পালা। দেখে শুনে বরের চেয়ে দেবর হতেই লোভ যাচ্ছে কিন্তু।

মল্লিকা বলেছে, বেশ আমার কি, যাব না আমি।

না না ছি, বললাম বলেই নাকি ?

মল্লিকা অবশ্য কৌতুক ক'রে জল না নিয়েই উপস্থিত হয়েছে, কি আবার ডাকছ কেন ?

জলের জন্য বললাম যে ? জল আনলে না কেন ?

সত্যিই খুব তৃষ্ণা পেয়েছে ?

হ্যাঁ, কিন্তু জলেই এ যাত্রা মেটাতে হবে।

তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ গল্প ক'রে গেছে মল্লিকা।

কিন্তু সে সব দিন আর নেই। মল্লিকার অনেক কর্তব্য বেড়েছে। অনেক দায়িত্ব। অলক্ষ্যে—জীবনের সংসারের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। কেবল স্বরূপ রয়ে গেছে একই জায়গায়। সে পঙ্গু, সে নড়তে পারেনি। কেবল তার জীবনেই কোন অভিজ্ঞতার ছাপ পড়ল না। এখন তার মাঝে মাঝে মনে হয়, ভূভারত খুঁজে অন্ধ, খঞ্জ, বোবা, বধির যেমনই হোক একটি মেয়েও কি পাওয়া গেল না স্বরূপের জন্য ? আর কিছু সে না হোক শুধু একটি মেয়ে ? মনে হয় অনুরূপ আর মল্লিকা ইচ্ছে ক'রে তাকে ঠকিয়েছে। কেবল সোহাগ

আদর ক'রে ভুলিয়ে রেখেছে, পাছে স্বরূপের সন্তান এসে সম্পত্তির অংশীদার হয়। স্ত্রীপুত্র নিয়ে সম্পূর্ণ আপন একটি সংসারের জন্য স্বরূপের মন হাহাকার ক'রে ওঠে।

বেলা দুপুরের সময় হাটখোলা থেকে নৌকাভরা কাঠ নিয়ে অনুরূপ ফিরে এল। কী কাঠফাটা রোদ। অনুরূপ এসেই জিজ্ঞাসা করল, হয়ে গেছে কাজটা?

স্বরূপ বলল, না খানিকটা বাকী আছে, হয়ে যাবে'খন।

অনুরূপ রেগে গিয়ে বলল, হয়ে যাবে'খন? এতক্ষণ কি করেছিস বসে বসে। কাজ নেই কর্ম নেই, কেবল গল্প আর গল্প?

স্বরূপও চটে গেল, কাজ না ক'রে কি মাগনা খাই তোমার সংসারে? নিজের কাছেই নিজেকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ দেখি। কাজ আমি করি, না, করি না? খুব খাটিয়ে নিয়েছ, আর কেন? এত আমি করব কার জন্যে? কে আছে আমার সংসারে?

অনুরূপ কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ চুপ ক'রে গেল।

মল্লিকা এদিকে এসেছিল, অনুরূপ বাধা দিয়ে বলল, না দরকার নেই তোমার ওদিকে যাওয়ার, এত করেও যখন ওর মন পাওয়া গেল না সংসারে নাকি ওর কেউ নেই, তখন তোমাকে আর যেতে দেব না আমি।

মল্লিকা হেসে বলল, এতকাল যেতে দিয়ে এখন তোমার আপত্তি হোলো এই বুড়ো বয়সে?

স্বরূপের কাছে গিয়ে মল্লিকা বলল, কি ভাই ঠাকুরপো, খুব যে ঝগড়া করা হচ্ছে। ঝগড়া করবার পালা আমার সঙ্গে, তোমার দাদার সঙ্গে তো নয়।

স্বরূপ একবার মুহূর্তের জন্য মল্লিকার দিকে তাকাল, তার চোখে আর ঠোঁটের কোণে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ যেন ঝলসে উঠল! মল্লিকা কি ভেবেছে

এমনি ছদ্ম সোহাগে আজীবন তাকে ভুলিয়ে রাখবে? নিজেদের গোপন উদ্দেশ্য চিরকাল তার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবে? মল্লিকা কি ভুলে গেছে সে চার সন্তানের মা? কোনো কথা না বলে স্বরূপ আবার তার কাজে মন দিল।

স্বরূপের চোখে কি ছিল কি জানি, মল্লিকার বুকে গিয়ে তা যেন তীরের মত বিঁধল। আরো কত দিনই তো স্বরূপ এমন রাগ ক'রে তার সঙ্গে কথা বলেনি, কিন্তু এমন ব্যথা তো কোনোদিন পায়নি মল্লিকা। অত্যন্ত বিমর্ষ মুখে মল্লিকা ফিরে গেল।

খাওয়া দাওয়ার পর মনটা একটু শান্ত হলে অনুরূপের মনে হোলো সত্যিই বড় স্বার্থপরের মত কাজ হয়েছে। সংসার নিয়ে, নানা বিষয়-আশয় নিয়ে এতদিন সে এমন মত্ত হয়ে ছিল যে, স্বরূপের দিকে তেমন ক'রে তাকাবার কথা ইদানীং তার মনেই হয়নি। মল্লিকার ওপর তার সমস্ত পরিচর্যার ভার দিয়ে স্বরূপের বিয়ের কথা প্রায় ভুলেই বসেছিল অনুরূপ, অবশ্য চেষ্টা সে কম করেনি আগে, কিন্তু আরো চেষ্টা দরকার। টাকার দিকে অনুরূপ তাকাবে না, যেমন করেই হোক বিয়ে সে দেবেই স্বরূপের। তাছাড়া স্বরূপ ইচ্ছা ক'রে না করলে তো কোনো কাজ তাকে আর করতে বলবে না অনুরূপ।

বিকালে সে নিজেই কাঠের ওপর সূক্ষ্ম কারুকার্য করতে বসল। কিন্তু মনে যত অটুট সংকল্পই থাক, হাত আর চলে না। এসব কাজ করতে ধৈর্য থাকে না অনুরূপের। এত দিনের অনভ্যস্ততায় সমস্ত চারুশিল্প যেন ভুলতে বসেছে অনুরূপ। কাজ কিছুতেই এগুলো না। বিরক্তি আর হতাশায় বারবার তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে লাগল। ইদানীং এসব কাজে বড় একটা হাতই দেয়নি অনুরূপ। বড়বড় শাল গাছের গুঁড়ি এসেছে বন্দর থেকে। কাঠের কারবার ক'রে পয়সা করবার দিকেই

তার ঝোঁক ছিল। বিষয়-আশয়, ক্ষমতা প্রতিপত্তি এই ছিল তার লক্ষ্য। কখন অলক্ষ্যে শিল্পীর দক্ষতা তার হাত থেকে খসে পড়ে গেছে সে টেরও পায়নি। মনের মধ্যে হঠাৎ যেন কেমন ক'রে উঠল অনুরূপের। শুধু স্বরূপই যে পঙ্গু তা নয়, শিল্পের দিকে নিজেকেও সে পঙ্গু ক'রে তুলেছে। এতদিন স্বরূপকে সে নিজেরই এক অংশ মনে করত। তার গৌরব, তার খ্যাতিতে নিজেকেই গর্বিত বোধ করত। আজ স্বরূপ যখন দূরে সরে যাচ্ছে, তখন অনুরূপের মনে হোলো তার খ্যাতি আর গৌরব নিয়েই সে যাচ্ছে—অনুরূপের জন্য তার কিছুমাত্র আর অবশিষ্ট রেখে যাবে না—অথচ সৌন্দর্যসৃষ্টির সম্পূর্ণ সুযোগ অনুরূপই তাকে দিয়েছে। সংসারের সমস্ত চিন্তা ভাবনা সমস্ত কাঠিন্য থেকে তাকে সে সন্তর্পণে দূরে সরিয়ে রেখেছে, না হলে এত কি বড় হতে পারত স্বরূপ। কিন্তু নেপথ্যে এই আত্মোৎসর্গের জন্য কোনো দামই থাকবে না অনুরূপের। সমস্ত কীর্তি, সমস্ত গৌরব কেবল স্বরূপেরই রয়ে যাবে।

স্নানের পর মাথা আঁচড়াবার সময় হঠাৎ বহুদিন পরে নিজের চেহারার দিকে চোখ পড়তে মল্লিকা চমকে উঠল। এত খারাপ হয়ে গেছে তার চেহারা, ভেঙ্গেচুরে এই ক'বছরে সে এমন জীর্ণ হয়ে গেছে, তা তো সে ধারণাও করতে পারেনি। ক্ষোভে আর লজ্জায় নিজের দিকে সে যেন নিজেই চাইতে পারল না। বহু সংকোচে সে স্বরূপকে খাবার পরিবেশন ক'রে এল। গোপনে একবার তাকিয়ে দেখল স্বরূপ ঠিক সেইভাবে আর তার দিকে চেয়ে নেই। অন্যমনে কি ভাবছে। তার চোখ থেকে মোহ খসে পড়ে গেছে আর মল্লিকার দেহ থেকে সৌন্দর্য আর যৌবন। মল্লিকার মনে হোলো স্বরূপের মোহই যেন এতদিন সেই সৌন্দর্যকে বাঁচিয়ে

রেখেছিল। নীরবে পরিবেশন ক'রে মল্লিকা চলে এল। কোনো কথা বলতে চেষ্টা করল না, স্বরূপও কোনো কথা বলল না।

কোলের ছেলেটা কাঁদতে লাগল; কিন্তু মল্লিকার আজ আর তাকে ধরতে ইচ্ছা করল না, কেমন যেন উদাস হয়ে গেছে মন।

রাত্রে গুহদের বাড়িতে ছেলেরা সখের থিয়েটার করবে। মেয়েদের বসবার জন্য আলাদা বন্দোবস্ত হয়েছে। পাড়ার মেয়েদের বিশেষ ক'রে নিমন্ত্রণ করেছে তারা, তাছাড়া অনুরূপের অবস্থা একটু ভালো হওয়ার পর ইদানীং খুব খাতির আর সম্মান করছে গুহরা।

মল্লিকা বলল, ছেলেপুলেরাই যাক আমি আবার কি দেখব ওর।

অনুরূপ জবাব দিল, সে ভালো দেখায় না, যখন বলে গেছে এত ক'রে। খোকার অন্নপ্রাশনে ও বাড়ির মেয়েছেলেও এসেছিল, মনে নেই তোমার?

মল্লিকা সাধারণ একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শাড়ী পরল। অনুরূপ দেখে বলল, ও কি, না না ভালো একটা দামী শাড়ী পরে যাও। মনে মনে স্বামীর এই ব্যাপারে এই মনোযোগে মল্লিকা খুশিই হোলো, মুখে বলল, কিন্তু এদিকে যে বুড়ো হয়ে গেলাম, বয়স তো হয়েছে, এখন কি আর ও সব ফ্যাসান মানায়?

অনুরূপ বলল, ফ্যাসান অবশ্য আমিও পছন্দ করি না। তবু ভালো একটা দামী শাড়ী পরেই যাও। না হলে লোকে ভাববে বাড়িতে দালান দিলে হবে কি, অনুরূপ তেমনই কৃপণ আর ছোটলোকই রয়ে গেছে।

মাত্র এই? মল্লিকার আর একদিনের কথা মনে পড়ল। কি কথায় কথায় মল্লিকা বলে ফেলেছিল, আর এখন তো বুড়ো হয়েই গেলাম, বয়স কম হোলো না কি?

শুনে স্বরূপের কি রাগ, আমার সামনে মুখেও এন না ও সব কথা।

মল্লিক হেসে বলেছিল, মুখে না আনলেই কি কথাটা মিথ্যে হয়ে যাবে? আমার বয়স তুমি জোর করেই কমিয়ে রাখবে নাকি ভেবেছ?
স্বরূপ জবাব দিয়েছিল, হ্যাঁ জোর করেই তো রাখব।
শাড়ীটা অবশ্য কি ভেবে মল্লিকা বদলিয়েই পরল, তারপর বলল, আর দেরি করো না, ঠাকুরপোর একটা বিয়ে দাও—খুব সুন্দরী মেয়ে যেন হয় টাকার জন্য ভেবো না, এতদিন দেরি করাই ভারি অন্যায় হয়ে গেছে।
অনুরূপ ভেবে অবাক হলো, হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে এ কথা বলল কেন মল্লিকা।
স্বরূপ নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। কি একটা নূতন মূর্তি খোদাই করেছে যেন। আজকাল অনেক কম কথা বলে স্বরূপ, মল্লিকাকে ডাকাডাকিও তেমন করেনা। নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া আর বিশেষ কোন কথাবার্তাও হয় না। মল্লিকার মাঝে মাঝে আসতে ভারি ইচ্ছা হয়, কিন্তু কোথায় যেন বাঁধে, কোথায় যেন একটু অভিমান আর সংকোচ লেগে থাকে। স্বরূপের মনের ভাব অবশ্য বদলায়নি। সে যেন এদের চাতুরী সব ধরে ফেলেছে; কেমন একটা ঘৃণাই তার মনে বদ্ধমূল হয়ে থাকে। গভীর মনোযোগে মূর্তি খোদাইর কাজ করতে থাকে স্বরূপ। ভিন্ন জেলার এক জমিদার বাড়ি থেকে বায়না দিয়ে পাঠিয়েছে। কাজ সুন্দর হলে টাকাও যেমন পাওয়া যাবে, যশও তেমন দূরে দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়বে! নিপুণ অভ্যস্ত হাত স্বরূপের তেমনই চলতে থাকে। কিন্তু মূর্তির মধ্যে তেমন লালিত্য আর সৌন্দর্য্য যেন আসতে চায় না। বিরক্ত হয়ে বার-বার নতুন ক'রে স্বরূপ কাজ আরম্ভ করে।
অনুরূপ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে, এই দু'তিনটা মাস গেলে বিয়ে সে যেমন করেই হোক অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে দিয়ে দেবে স্বরূপের।

একটা সম্বন্ধ প্রায় ঠিক হয়েই আছে ; কিন্তু সমস্ত সংসারে যেন আর রস নেই। জায়গায় বসে বসে স্বরূপ যেমন হাঁক ছাড়ত তেমন আর করে না। তার হাসিতে উল্লাসে সমস্ত বাড়ি যেমন চঞ্চল হয়ে উঠত, তেমন আর হয় না। কিন্তু মল্লিকা যেমন গৃহকর্ম করত, সন্তান পালন করত, তেমনি ক'রে যায়। কাঠের কারবার অনুরূপের তেমন চলতে থাকে। কিন্তু সংসারটাও যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। একেক সময় এই বিষয়-আশয়, কারবারপত্র ভারি দুর্বহ মনে হয় অনুরূপের। বেশ আছে স্বরূপ, নিজের ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে বেশ আছে সে, আর ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি ক'রে অনর্থক নিজেকে ক্ষয় ক'রে ফেলেছে অনুরূপ। বিয়ে ক'রে ছেলেপুলে নিয়ে অকালে বুড়ো হতে চলেছে। বুড়ো হতে চলেছে মল্লিকা। কিন্তু স্বরূপ নিজেকে ধরে রেখেছে, একটুও অপচয় হতে দেয়নি। যৌবনকে বেঁধে রেখেছে। সমস্ত ভবিষ্যৎ তার সামনে। আর অনুরূপ কেবল অতীতের বস্তু। এতকাল যে যৌবনের সৌন্দর্যকে সে আকণ্ঠ পান করেছে তা অনুরূপের মনে পড়ল না, ভবিষ্যৎকে সে যে আর স্বরূপের মত উপভোগ করতে পারবে না, এই ক্ষোভই তার মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখল।

কিন্তু হঠাৎ সেদিন স্বরূপের মুখের দিকে তাকিয়ে অনুরূপ চমকে উঠল, চুলগুলো উস্কোখুস্কো, চোখ দুটো লালচে। অনুরূপ ধমক দিয়ে বলল, খুব রাত জেগেছিস বুঝি ?

স্বরূপ বলল, না।

না তো শরীর দিনের পর দিন অমন খারাপ হচ্ছে কেন ? কি এত কাজ। কি এমন তোর দুর্গোৎসব পড়েছে শুনি।

স্বরূপ অল্প একটু হাসল, ও কিছু না, তুমি ভেবোনা দাদা।

স্বরূপ তো বলল ভেবোনা, কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতেই পড়ল জ্বরে। অনুরূপ বলল, কিরণ ডাক্তারকে 'কল' দিই কেমন?
স্বরূপ বলল, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন।
কিন্তু ব্যস্ত শেষ পর্যন্ত হতেই হলো। কিরণ ডাক্তার বলে গেল, জ্বরটা ভাল নয়। কয়েকদিন বাদে বলল, ডবল নিউমোনিয়া। শহর থেকে পর পর দু'জন ডাক্তারকে দেখাল অনুরূপ, কিন্তু কারো ভাবভঙ্গিতেই ভরসা পেল না। সদর থেকে আরো বড় ডাক্তার আনতে যাবে স্বরূপ তাকে ইসারায় থামিয়ে ফিস ফিস ক'রে বলল, যাবে যাও, বারণ তো তুমি শুনবে না। কিন্তু আমার বড় ইচ্ছা তুমি এ সময় আমার কাছে থাক।
অনুরূপ ফের ধমক দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু উপস্থিত সবাই সেই পরামর্শই দিল। মরবার আগে স্বরূপ বড় ভাইকে তার একটা ইচ্ছা জানিয়ে গেল। তার শেষ অসম্পূর্ণ মূর্তিটা যেন সম্পূর্ণ করে অনুরূপ। অনুরূপ চোখের জলের ভিতর দিয়ে বলল, আচ্ছা, কিন্তু তোর হাতের কাজে বাটালি ধরতে কি আমি পারব।
স্বরূপ বলল, তুমি আমার চেয়ে অনেক ভালো পারবে।

শোকাচ্ছন্ন কয়েকটি দিন কাটল। অনুরূপের কোন কাজে মন নেই, খেয়াল নেই কোন দিকে। একদিন মল্লিকাই মনে করিয়ে দিল, ঠাকুরপো কি একটা মূর্তির কথা না বলেছিল শেষ সময়?
অনুরূপ বলল, ঠিক ঠিক, তার শেষ ইচ্ছা তো রাখতে হবে। কোথায় সেই মূর্তি? যদি তাই নিয়ে একটু অন্যমনস্ক থাকা যায়, স্বরূপের কাজ নিয়ে ভুলে থাকতে হবে অনুরূপকে।
পাটের মোটা একটা চট দিয়ে ঢাকা মূর্তিটা স্বরূপের ঘরেরই এক

কোণে পড়ে ছিল। বড় ছেলের সাহায্যে ধরাধরি ক'রে মূর্তিটাকে আরো একটু সামনের দিকে এগিয়ে আনল অনুরূপ। চটটা সরিয়ে ফেলল। তবু এ'কয় দিনেই বেশ ধুলো জমেছে। মাকড়সা মাথার ওপর দিয়ে বুনে গেছে জাল।

অনুরূপ মল্লিকাকে ডেকে বলল, পরিষ্কার শুকনো একখানা ন্যাকড়া নিয়ে এসো তো।

আলমারীর মাথার ওপর থেকে ছেঁড়া কাপড়ের বোচকাটা পেড়ে ন্যাকড়া বের করতে একটু দেরি হল মল্লিকার। তারপর সেখানা হাতে ক'রে এসে বলল, এই নাও, কি মূর্তি কেটেছ ঠাকুরপো।

অনুরূপ রূঢ় কণ্ঠে বলল, দেখ চিনতে পার কিনা।

চেনা কঠিন নয়। মল্লিকারই আবক্ষ প্রতিকৃতি। এখনকার ভাঙ্গাচোরা ক্ষয়ে যাওয়া মল্লিকার নয়। দশ বৎসর আগের সেই যৌবনোচ্ছলা সপ্তদশী মল্লিকা আবার এসে সামনে দাঁড়িয়েছে।

মূর্তিটাকে একবার দেখেই মল্লিকা সলজ্জে তাড়াতাড়ি সরে যাচ্ছিল, অনুরূপ হাত বাড়িয়ে তার শীর্ণ হাতখানা চেপে ধরল, যেয়ো না দাঁড়াও।

মল্লিকা সভয়ে বলল, কি বলছ?

অনুরূপ অদ্ভুত একটু হাসল, দাঁড়াও এখানে—বাকিটা তো আমাকেই শেষ করতে হবে।

শম্বুক

কচুরির গাটনায় সমস্ত নদীটা ঢাকা পড়ে আছে। জানালা দিয়ে যতটা দেখা যায় কেবল সবুজ পাতাওয়ালা বড় বড় কচুরি। দেখতেই ভয় করে। নিজেদের ঘাট দিয়ে যখন ছোট ছোট কচুরিগুলিকে ভেসে যেতে দেখত, ছেলেবেলায় ভারি আনন্দ হোতো সুপ্রিয়ার। সাঁতার দিয়ে অনেকগুলো ফুলসুদ্ধ এককেটা কচুরির ঝোপকে সুপ্রিয়া তুলে নিয়ে আসত। কচুরির গাছকে ছোট ফুল গাছের মতই সুন্দর মনে হোতো সুপ্রিয়ার। তখন কে ভেবেছিল তার রূপ এমন বীভৎস হতে পারে। তিন দিন ধরে গাটনা পড়ে আছে নদীতে। পারাপার সব বন্ধ প্রায়। অতি কষ্টে দু'একখানা ডিঙি নৌকো দেড় ঘণ্টা দু'ঘণ্টা বসে এপার ওপার হচ্ছে, ভিড় বাঁচিয়ে এপারে যে দু'চারজন মাষ্টার আর কেরানী সখ ক'রে এসে বাসা বেঁধেছে, খেয়াপারের এই ব্যবস্থাই তাদের সম্বল। আর কি অদ্ভুতই যে এখানকার পারাপারের ব্যবস্থা! একটা ব্রীজ ক'রে নিলেই তো হয়। কিন্তু জমিদার নাকি তা হতে দেয় না। তার চেয়ে বছর বছর খেয়াঘাট ইজারা দিয়ে জমিদারের অনেক লাভ। আর এখানকার লোকগুলিই বা কি কুঁড়ে। জমিদারের উপদ্রবই শুধু নয়, কচুরির অত্যাচারও সহ্য করে। কচুরিগুলিকে তারা ঠেলে সরিয়ে দিতে পারে না? অথচ পারাপার তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন। আর কি অদ্ভুত এই রূপগঞ্জ শহরের গড়ন। দু'দিকে দু'টুকরো হয়ে রয়েছে।

আচ্ছা, নদীই একে ভেঙ্গেছে না এমন টুকরো টুকরো ভাবেই এদের জন্ম? বোধ হয় তাই হবে। এ শহরের কোনো প্লান নেই। যার যে পারে খুশি ঘর তুলেছে, দোকান পেতেছে বাজার মিলিয়েছে। শহর? রূপগঞ্জ আবার শহর। একটা আদালত, স্কুল আর বাজার থাকলেই যদি তা শহর হোতো। কিন্তু রূপগঞ্জ নামটা ভারি সুন্দর। নাম। নাম আর রঙের জন্য সুপ্রিয়া যে কোনো জিনিসকে সহ্য করতে পারে। না, দৃশ্যটা নিতান্ত মন্দ নয় এখানকার। ওপারের সারি সারি গুদাম ঘরগুলির টিনের চালার ওপর জ্যোৎস্না এসে পড়ে রূপোর মত দেখাচ্ছে। আর তাদের এপারের খণ্ডটিকে মনে হচ্ছে ছোট্ট একটি দ্বীপের মত।

সুপ্রিয়া টের পাচ্ছে তার এলো ক'রে জড়ানো খোঁপার ওপর নীলাম্বর এসে আলগোছে তার আঙুলের ডগাগুলো রেখেছে। আদরের এই ভঙ্গিটুকু নীলাম্বরের পুরানো।

'রাত তো অনেক হয়েছে। শুতে যাওনি কেন?'

সুপ্রিয়া প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেল, বলল, 'শেষ হোলো তোমার লেখা?'

'হাঁ, হয়েছে মোটামুটি।' নীলাম্বরের স্বর একটু উচ্ছল, একটু বা উল্লসিত, 'বাঃ চমৎকার জ্যোৎস্না তো বাইরে। শুতে যেতে আমার ইচ্ছে করছে না। একটা গান করবে? আচ্ছা এখানে বসেই গুনগুন করোনা একটু।' গানে গুনগুন করতে যদি পারত নীলাম্বরই করত।

সুপ্রিয়া বলল, 'ভালো হয়েছে বুঝি লেখাটা?' নিস্পৃহ উৎসাহহীন সুপ্রিয়ার স্বর, শুধু তাই নয়, অতি অনাবশ্যক একটা খোঁচা।

সন্ধ্যা বেলার কথাটা এতক্ষণে নীলাম্বরের মনে পড়েছে। একটু গম্ভীর-ভাবে বলল, 'কি ক'রে বুঝলে?'

সুপ্রিয়া তীক্ষ্ণ একটু হাসলে, 'আমাকে গান গাইতে বলছ যে। তোমার কলম দিয়ে যখন ভালো লেখা ঝরবে আমার গলা দিয়ে তখন

সুর ঝরবে না কেন। তোমার মন যখন গুনগুন করছে আমার মনেরও তখন গুনগুন করাই তো উচিত।'

নীলাম্বর দাঁতে দাঁত চাপল, তারপর বলল, 'কিন্তু ঔচিত্য বড় কঠিন, বড় নীরস কিনা তাই ওদিক আমরা বড় ঘেঁষতে চাই না। আমার মন যখন গুনগুন করে তোমার তখন হুল ফোটাবার দিকে মন যায়। দুজনে মিলে আমরা একটি মৌমাছি।' নীলাম্বরের স্যাণ্ডালের শব্দ ওঘর পর্যন্ত গিয়ে মিলিয়ে গেল।

ওপারের নদীর ধারের একটা চালা ঘর থেকে ঠন্ঠন্ শব্দ এতক্ষণ শোনা যাচ্ছিল। বোধ হয় ঝালাইকারদের ঘর হবে। অনেক রাত অবধি ওরা কাজ করে। সে শব্দ এখন বন্ধ হয়েছে। হয়ত এতক্ষণে তারা শুয়ে পড়ল। কি দোষ ছিল সুপ্রিয়ার? রবিবার। অফিস ছিল না। সারাদিন নীলাম্বর কেবল লিখছিল আর ছিঁড়ছিল। সুপ্রিয়া সংসারী কাজকর্ম করল, একটা মাসিকের পাতা উল্টাল, বীরেনবাবুদের বাসায় গিয়ে গল্প ক'রে এল কিছুক্ষণ, সারল দৈনন্দিন সান্ধ্য প্রসাধন, তখনও নীলাম্বর কেবল লিখছে আর কাটছে। সুপ্রিয়া গিয়ে কাছে দাঁড়িয়েছিল, বলেছিল, 'এই, যাও এখন ঘুরে এস একটু নদীপার দিয়ে, এত যদি কাটছ তবে লিখছ কি, সব সময়েই কি লেখা যায়?'

নীলাম্বর বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিল, তার সমস্ত মুখে পশুর হিংস্রতা, ঠিক সুপ্রিয়ার গলার ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণ ক'রে বলেছিল, 'এই যাও বীরেনবাবুর বাসা থেকে একটু ঘুরে এস না, সব সময়েই কি এখানে আসতে হয়?'

সুপ্রিয়া নীরবে বেরিয়ে এসেছিল।

লেখক হলেই কি অভদ্র হতে হবে, স্বামী হলেই কি ইতর হতে হবে? আর এমন শুধু আজই যে প্রথম তা নয়, এমন প্রায় প্রত্যেক দিন।

সুপ্রিয়ার যেন আলাদা কোনো জীবন নেই, অস্তিত্ব নেই, নেই তার নিজের ভালোলাগা না-লাগা। সে শুধু নীলাম্বরের মনের বিভিন্ন অবস্থার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। নীলাম্বর অন্তত তাই চায়। যখন ভালোলাগে নীলাম্বরের, ভালো কোনো আইডিয়া আসে মাথায়, তখন নীলাম্বরের উচ্ছ্বাসের বন্যায় তাকে ভেসে যেতে হবে, হাসতে হবে, গান গাইতে হবে। আর নীলাম্বর যখন লিখতে পারবে না, যখন লেখা কাগজ টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলতে থাকবে, তখন সুপ্রিয়া কেন দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে রক্তাক্ত হতে থাকবে না, আত্মহত্যা ক'রে মরবে না কেন?

প্রথম প্রথম হেসেছে সুপ্রিয়া, পাগলামি ভেবে প্রশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু এতো পাগলামি নয়, কলম নিয়ে বসলেই পাগল সাজবার কারো অধিকার থাকে না। নীলাম্বরের এ পাগলামি নয়, হীন স্বার্থপরতা। নীলাম্বর চেনে শুধু নিজেকে, নিজেকেই সে একমাত্র ভালোবাসে।

নীলাম্বর ফিরে এল তার লিখবার ঘরে। নতুন লেখাটা নিয়ে প্রথম দিক থেকে চেষ্টা করল একটু পড়তে। কিন্তু কিছুক্ষণ আগেও যেমন ভালো লেগেছিল তেমন আর লাগল না। নীলাম্বর জানত এমনই হবে, এমনই হয়। কাল আরো খারাপ লাগবে, পরশু আরো। নীলাম্বর টেবিলের এক ধারে ঠেলে রাখল লেখাটা। তার সারাদিনের পরিশ্রমের ফল।

কি ঝগড়াটে মেয়েই হয়েছে সুপ্রিয়া। এই সাত আট বছর পরেও সেই গেঁয়ো স্বভাব তার রয়েই গেছে; বদলেছে কেবল তার বাইরেটা। নীলাম্বরের সাহচর্য শুধু কি তার বাইরের ঔজ্জ্বল্যই বাড়িয়েছে? অন্তরকে সমৃদ্ধ করেনি? সুপ্রিয়া শিখেছে সাজসজ্জা; আর সূক্ষ্ম শিল্পের

মতই কথার সে অনুশীলন করেছে—ঠিক তার প্রসাধনের মত। এর চেয়ে তার সেই গেঁয়ো ভাষায় ঝগড়াও যেন ভালো ছিল। এমন তীক্ষ্ণ বাঁকা ফলকের মত শ্লেষ সে কোথায় শিখল, কোথায় পেল এমন ব্যঙ্গের বিষাক্ত ভঙ্গি।

একি নীলাম্বরের নিজেরই শিক্ষা? তার কথা থেকে, তার লেখা থেকেই কি এসব সংগ্রহ করেছে সুপ্রিয়া? তার লেখার মতই কি সে ব্যর্থ নিষ্ফল, ভাবহীন, প্রাণহীন শুধু ভঙ্গিসর্বস্ব ভাষা? নীলাম্বর তার আত্মপীড়নে ফিরে এসেছে! একি সুপ্রিয়ার দোষ নয়, সুপ্রিয়াই নয়, নীলাম্বরেরই বিকৃত প্রতিধ্বনি। সবাই ভাবে, সুপ্রিয়াও ভাবে, নীলাম্বর দাম্ভিক স্বার্থপর, সে শুধু নিজেকে ভালোবাসে। কিন্তু ঠিক নিজেকে নয়, নীলাম্বর ভালোবাসে নিজেকে টুকরো টুকরো করতে।

আরও কিছুক্ষণ পরে সুপ্রিয়া এসে দাঁড়াল, 'রাত আর বেশি নেই, চল শোবে।'

বেশ একটু বেলাতেই নীলাম্বরের ঘুম ভাঙল। চোখ মেলে দেখল সুপ্রিয়া কখন উঠে গেছে। নীলাম্বর আবার চোখ বুজল, কিন্তু বেশিক্ষণ এভাবে চোখ বুজে থাকা যায় না, জানালা দিয়ে রোদ এসে গায়ে পড়েছে। হাত বাড়িয়ে জানালার একটা পাট ঠেলে দিতে যাচ্ছে, সুপ্রিয়া এসে ঘরে ঢুকল। স্নান সেরে চা ক'রে এনেছে রান্নাঘর থেকে, আর একটা প্লেটে কতকগুলি সাদা ফুল। মুচকি হেসে বলল, কবিরা ফুল ভালবাসে।

নীলাম্বর চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'ফুল খেতে ভালবাসে না তা বলে।'

'জানো না, অনেক ফুলই খাওয়া যায়, এমন কি তোমাদের এই কচুরি ফুলেরও বড়া খেতে মন্দ লাগে না। কোনো জিনিসই অকেজো নয় একেবারে। দেখেছ কচুরির গাটন অনেক পাতলা হয়ে গেছে, আজ

ওপার বেড়াতে যাবে। ক'দিন ধরে শ্যামলবাবু আর বীরেনবাবুর বউয়ের মুখ দেখেই কাটল।'

নীলাম্বর বলল, 'কেন শ্যামলবাবু আর বীরেনবাবুর বউয়ের মুখ মন্দ কি?'

কপট ঈর্ষার ভঙ্গিতে সুপ্রিয়া বলল, 'হুঁ তাতো বলবেই। পরের বউয়ের মুখ কেউ মন্দ দেখে না, বিশেষ ক'রে সাহিত্যিকরা।'

নীলাম্বর বলল, 'দেখ, পরের বউয়ের মুখের দিকে চাওয়া যদি এক আধটু অভ্যাস করতাম, তা হলে তোমার কাছে এমন সুলভ হতাম না, একটু মান থাকত।'

'খবরদার অমন কাজও কোরো না, তা হলে আর মুখ দেখাবার জো থাকবে না।'

মুখ দেখানটা দরকার। এই সামাজিক চেতনা সুপ্রিয়ার প্রথম থেকে। তখনকার একদিনের কথা নীলাম্বরের মনে পড়ছে। নীলাম্বর একটা কবিতা লিখেছিল। তার ভাবটা ছিল, তোমার চুল খুলে দাও, সেই চুলের আড়ালে ঢেকে রাখব আমার মুখ, লুকিয়ে রাখব নিজেকে সমস্ত পৃথিবী থেকে।

সুপ্রিয়া হেসে উঠেছিল, 'ও বাবা অত চুল পাব কোথায়। আর তা হলে কি লোকের কাছে মুখ দেখাবার জো থাকবে, বদনাম রটবে দুজনেরই।'

কাকে মুখ দেখাতে চায় সুপ্রিয়া? শুধু নীলাম্বরকে বুঝি নয়। সুপ্রিয়ার ঘোমটার আড়ালে শুধু কি দেখবার আর দেখাবার লুব্ধতা?

কিন্তু নীলাম্বর তো তা চায় না, সে দেখাতে চায় না নিজেকে, সারাজীবন সে কেবল পালিয়ে বেড়াচ্ছে, মানুষের কাছ থেকে কেবল লুকোতে চেয়েছে, পৃথিবীকে সে ভয় করে, ভয় করে মানুষের দৃষ্টিকে। আর সমস্ত পৃথিবীময় কেবল অসংখ্য মানুষ যারা কিলবিল করছে পোকার মত, মশকের মত দুঃসহ গুঞ্জন তুলছে।

আট ন'ঘণ্টা অফিসের ক্লান্তি। সারাদিন কাগজপত্রের ফাইল সামনে ক'রে ঝুঁকে থাকতে হলো নীলাম্বরকে। অবশেষে সন্ধ্যার দিকে মুক্তি। কিন্তু বাসায় ফিরে এসে নীলাম্বর দেখল সুপ্রিয়া এখনও ফেরেনি। ক'দিন পরে সে ছাড়া পেয়েছে। মনের সাধ মিটিয়ে গল্প করবে, গল্প করতে পারলে মেয়েরা আর কিছু চায় না। চাকর শম্ভু বসে বসে বিড়ি টানছিল, নীলাম্বরকে দেখে তাড়াতাড়ি বিড়িটা আঙুলের আড়াল ক'রে বলল, 'আপনার খাবার ঢেকে রেখে গেছেন মা।'

নীলাম্বর বলল, 'কৃতার্থ করেছেন।'

তবু খবর যেটুকু আছে শম্ভু জানাবেই, 'বীরেনবাবুর বাসার মেয়েদের সঙ্গে থানার বড়বাবুর বাসায় গেছেন বেড়াতে, ফিরতে একটু দেরি হলে—'

নীলাম্বর বলল, 'আমাকে রান্না চড়াতে বলে গেছেন বুঝি।'

শম্ভু বলল, 'না বাবু।'

'আচ্ছা তুই যা।'

একটু পরে শ্যামলবাবু এলেন তাঁর বাসা থেকে। নীলাম্বর বলল, 'কি খবর?'

'চায়ের নেমন্তন্ন ক'রে পাঠিয়েছে আমার স্ত্রী। এত কাছে আছেন অথচ আলাপ নেই। আপনিও যেমন লাজুক, সেও তেমনি, কিন্তু আপনাকে সে চেনে, আপনার লেখা খুব পড়েছে, খুব নাকি ভালো লাগে তার।'

'তাই নাকি? তবে তো আমারই তাঁকে চা খাইয়ে দেওয়া দরকার।'

শ্যামলবাবু বললেন, 'কি যে বলেন, আমার অবশ্য গল্পটল্প ততো ভালো লাগে না, পরে একটু লজ্জিত হয়ে বললেন, মানে শুধু আপনার বলে নয়—'

নীলাম্বর সপ্রতিভভাবে বলল, 'তাতে কি? গল্প তো শুধু ছেলেমানুষ আর মেয়েমানুষের জন্যই।'

সুপ্রিয়া এল সন্ধ্যার পর, কথায় কথায় একটু দেরি হয়ে গেল। রাগ করনি তো।

নীলাম্বর একটু তাকাল সুপ্রিয়ার দিকে। দেরি হওয়ার জন্য কিছু মাত্র অনুশোচনা নেই। এ ছদ্ম সৌজন্য কেন। সমস্ত মুখ সুপ্রিয়ার আনন্দে ঝলমল করছে। সে যেন সম্পূর্ণ নতুন জীবন লাভ করছে। ক'দিন সে শুকিয়ে ছিল, আজ এই সন্ধ্যায় সে নতুন ক'রে ফুটে উঠেছে, নিজের সৌরভে নিজেই সে আমোদিত। নীলাম্বরকে তার না হলেও চলে। বরং নীলাম্বরের কাছেই সে নিষ্প্রাণ, শুষ্ক দুঃসহ।

নীলাম্বর বলল, 'না রাগ করব কেন?'

নীলাম্বর লক্ষ্য করল সুপ্রিয়া কেবলই হাসি চাপবার চেষ্টা করছে।

'কি ব্যাপার হাসছ কেন?'

'না অমনিই। হেমাঙ্গবাবুর ক্যারিকেচার মনে পড়ছে।'

'হেমাঙ্গবাবু আবার কে?'

'পারুলের দাদা। ভারি চমৎকার লোক। দিল্লীতে পাঁচশ টাকা মাইনে পান। এখানে ছুটিতে বেড়াতে এসেছেন বোনকে দেখতে, অবশ্য বোনকে দেখতে শুধু নয়, রমলা এসেছে খবর পেয়েছেন কিনা।'

'রমলা আবার কে এল?'

'পারুলের কি রকম ননদ, বিয়ে পাশ করেছে এবার, বেশ সুন্দরী মেয়ে, ওই যে সুশান্ত সেন, উপন্যাস লিখে যিনি খুব নাম করেছেন তাঁরই বোন। পৃথিবীর সমস্ত ভিড়কে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে সুপ্রিয়া। সুশান্ত সেনকে ছেড়ে সুপ্রিয়া নিজেই আবার হেমাঙ্গবাবুতে এসে পড়ল, 'বেশ সুপুরুষ হেমাঙ্গবাবু আর এত আমুদে লোক, দারুণ গল্প করতে পারেন। সব রকমের গুণ আছে ভদ্রলোকের, গানবাজনার চর্চাও আরম্ভ করেছেন দিল্লীতে। দু-একবার অনুরোধ করতে গানও শোনালেন একখানা।'

নীলাম্বর বলল, 'থামলে কেন, হেমঙ্গবাবুর গুণবত্তার বর্ণনা শেষ হয়ে গেল এরই মধ্যে ?'

সুপ্রিয়া হঠাৎ যেন থমকে গেল। স্থির দৃষ্টিতে তাকাল নীলাম্বরের মুখের দিকে, বলল, 'ও আমারই ভুল, পরমুহূর্তে চোখ রগড়ে বলল, দেখলাম আমারই ভুল হয়েছে। তাইতো আমার তো এসব দেখবার কথা নয়। দেখলাম হেমাঙ্গ নামে একটা ছোঁড়া একখানা পা তার খোঁড়া, পাঁচ টাকা মাইনেয় কোথায় চাকর খাটে আর রমলা নামে টাক পড়া এক বুড়ী। খুব ঝগড়া হচ্ছে তাদের মধ্যে, দাম্পত্য কলহ।'

নীলাম্বরের তীক্ষ্ম দৃষ্টি বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠল সুপ্রিয়ার চোখের উপর। তারা সব জানে, পরস্পরকে তাদের আর চিনতে বাকি নেই। কতদিন তারা নিজেকে নিঃসঙ্কোচে অনাবৃত করেছে পরস্পরের কাছে। তাই কি পরস্পরের খুঁত তারা এমন নিখুঁত ভাবে চিনেছে, তাই কি আভরণ ভেদ ক'রে তাদের দৃষ্টি শুধু ক্ষতস্থানে গিয়েই বিদ্ধ হয় ? দুই ধারাল তরবারির মত তাদের মিল কি শুধু আঘাতে আঘাতে ?

নিঃশব্দে সুপ্রিয়া বেরিয়ে এল ঘর থেকে, সমস্ত অন্তর তার বেদনায় ক্লিষ্ট হয়ে উঠেছে। সারাজীবন কি এমনি করেই কাটবে ? পৃথিবীর কোনো সার্থকতার কথা, কোনো ঐশ্বর্যের কথা ভুলেও নীলাম্বরকে শোনান যাবে না, নীলাম্বর তাতে ব্যথা পায়, তার অসার্থকতাকে তা ব্যঙ্গ করে। নীলাম্বর একদিন বলেছিল, তুমি আমার সমস্ত পৃথিবী, আমি লুকিয়ে থাকতে চাই তোমার মধ্যে। কিন্তু লুকাবার জন্যে তো পৃথিবীর প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধু গহ্বরের। সংকীর্ণ কুৎসিত গহ্বর নিঃশ্বাসে যা বিষাক্ত হয়ে উঠে। পৃথিবীর ঐশ্বর্য সুপ্রিয়ার মধ্যে নেই, কিন্তু তার উপভোগের আনন্দও কি নীলাম্বরের সহ্য হবে না ? সে কি শুধু খুঁড়ে খুঁড়ে গহ্বর তৈরী করবে ? নীলাম্বরের সমস্ত সাহিত্যচর্চাও কি তাই ? সেও শুধু

তার নিজেকে ঢাকবার নিজেকে লুকাবার গুহা মাত্র। এইজন্যই কি সেখানেও সে স্বস্তি পাচ্ছে না; কেবল নিজেরই প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছে? নদী পরিষ্কার হয়ে গেছে আজ। স্বচ্ছ স্ফটিকের মত জল। নীচে তারাভরা আর এক আকাশ স্পন্দিত হচ্ছে। ওপরের দিকে চাইতে সুপ্রিয়ার ইচ্ছা করছে না, আকাশের চেয়ে আকাশের এই ছায়া যেন আরো সুন্দর।

ওপার থেকে জয়ঢাক আর কাড়ার কর্ণভেদী আওয়াজ ভেসে আসছে। আর হল্লার শব্দ! কোত্থেকে এক সার্কাসের দল এসেছে, ছোট্ট শহর তাতেই তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে। আশেপাশের গ্রাম থেকে কেবলই ভেঙ্গে পড়ছে জনতা। আনন্দ কত সহজ কত সুলভ, যেখানে সেখানে ছড়ান রয়েছে শুধু কুড়িয়ে নিলেই হয়। কাল ওদের স্পেশাল শো। থানার স্টাফ সব যাবে। হেমাঙ্গ আর রমলা তাকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ ক'রে রেখেছিল।

হেমাঙ্গ আর রমলা। কি সুন্দর, কি চমৎকার তাদের জীবন। সমস্ত পৃথিবী যেন শুধু তাদের জন্যই। কাউকে তারা বাদ দিতে চায় না কিছুই ছাড়তে চায় না, সমস্ত কিছু যেন তাদেরই অলংকার—তাদেরই অহংকার। একঘর লোকের মধ্যেই হেমাঙ্গ আর রমলা যেন পরস্পরকে বেশি উপভোগ করছিল। ভিড় তারা ভালবাসে, ভিড় থেকে নয়, ভিড়ের মধ্যেই তারা লুকাতে চায়। হেমাঙ্গ আর রমলা। বেশি কথা তাদের দরকার হয় না। শুধু আভাস ইঙ্গিতই যথেষ্ট।

আর আজকাল বেশি কথা নীলাম্বর সুপ্রিয়ারও প্রয়োজন হয় না। শুধু আভাস আর ইঙ্গিত তাদেরও যথেষ্ট।

সহসা সমস্ত মন সুপ্রিয়ার বেদনায় অভিভূত হয়ে গেল। রাগ নয়, নীলাম্বরের ওপর করুণ সহানুভূতিতে আর্দ্র হয়ে উঠল মন। অনুকম্পা

হতে লাগল। আঘাত নয় আর, কলহের শেষ হোক। ঈর্ষার দহন থেকে সে তাকে স্নিগ্ধ শ্যামল পৃথিবীর মাঝখানে নিয়ে আসবে, শিল্পসৃষ্টির মধ্যেও নিজের পঙ্গুতাকেই যদি নীলাম্বর শুধু প্রত্যক্ষ করতে থাকে, সেখানেও শুধু যদি ঈর্ষা আর প্রতিযোগিতা তাকে দগ্ধ করতে থাকে, সেই গুহা নীলাম্বর ছেড়ে আসুক। জীবনের আরো অনেক দিক আছে, জীবন আরো বড়, আরো বিচিত্র। সুপ্রিয়া নীলাম্বরের পৃথিবী হতে চায় না, এই বিপুল পৃথিবীর মাঝখানে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নীলাম্বরের সঙ্গেই সমস্ত পৃথিবীকে সে উপভোগ করতে চায়।

কিন্তু লিখবার ঘরের ঠিক সামনে এসে সুপ্রিয়া থমকে দাঁড়াল। সমস্ত ঘর ভরে অস্থিরভাবে পায়চারী করছে নীলাম্বর। তার চোখে সন্ধ্যাবেলার সেই হিংস্রতা, এ ঘরের জানালা দিয়েও সেই তারায় ভরা আকাশ দেখা যাচ্ছে। পূব দিকে গোল হয়ে এতক্ষণে চাঁদ উঠে এসেছে আকাশে। আয়নার মত নদীর স্থির স্বচ্ছ জল টল টল করছে। জ্যোৎস্নার অজস্র প্লাবনে ছোট্ট শহর নিজেকে মেলে ধরেছে। কিন্তু নীলাম্বরের চোখে বিস্ময় নেই, মুগ্ধতা নেই, সে আজো লিখছে। সহসা কালকের রচনাটাকে নীলাম্বর নির্মমভাবে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলল। তৃপ্তি নেই সন্তুষ্টি নেই কিছুতে। কয়েকখানা সাদা পাতা টেনে আবার সে লিখতে আরম্ভ করেছে। অমন সুন্দর আর এক পৃথিবী সৃষ্টি না করা পর্যন্ত সে থামবে না।

সুপ্রিয়া দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়ে রইল।

যযাতি

একটু একটু ক'রে ভুবনবাবুর সেবা আর পরিচর্যার ভার সুব্রতের হাতে এসে পড়ল। দুর্ঘটনাকে কেউ তখনো স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। ভুবনবাবুর বৃদ্ধা মা শুধু কাঁদছেন, হিমানী লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন, কিছু করতে বললে বলছেন, 'আমাকে কিছু বোলো না সুব্রত। আমি সব করতে পারব, কিন্তু ওঁর ওরকম অসহায় দৃষ্টি সহ্য করতে পারব না।'

সুব্রত সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'কিন্তু আপনাকেই তো সহ্য করতে হবে মামীমা।' এর চেয়ে বেশি যে সুব্রত কি বলতে পারে তা সে ভেবে পায় না।

অমূল্য আরো বেশি নার্ভাস এবং সব বিষয়েই অপটু। বিশেষ ক'রে এই দুর্ঘটনায় সে এত বিহ্বল হয়ে পড়েছে যে তাকে প্রকৃতিস্থ করতেই আর একজনের প্রয়োজন। চিকিৎসকের অসাবধানতার জন্যই হোক বা যেমন করেই হোক কথাটা প্রকাশ হয়ে গেছে, ভুবনবাবু দক্ষিণ অঙ্গ যে তুলতে পারছেন না—এটা পক্ষাঘাতের লক্ষণ। জীবনে এটা আর নিরাময় নাও হতে পারে।

শুশ্রূষা পরিচর্যায় আবাল্য সুব্রতের অভ্যাস আছে। সুনিপুণ তৎপরতায় এ সব সে করতে পারে, কিন্তু প্রবোধ সান্ত্বনা দিতে হলে সে বড় অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। বিশেষতঃ এদের নিজেরই যখন আশ্বস্ত

হওয়া উচিত। চিকিৎসা সবে আরম্ভ হলো। অর্থব্যয়ের সাধ্যও এঁদের আছে। কিছুদিন ভুবনবাবু শয্যাশায়ী হয়ে থাকলে সংসার অচল হবে তাও নয়। বলতে গেলে কলেজ তো তাঁর নিজের হাতেই গড়া। কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত বিবেচনাই ভুবনবাবুর সম্বন্ধে করবেন।

কিন্তু পরমুহূর্তে নিজের রূঢ় মনোভাবে সুব্রত লজ্জিত বোধ করে। হৃদয়ের কোমলবৃত্তি বোধ হয় কিছু তোর নেই। মায়ের স্নেহ, স্ত্রীর ব্যাকুলতা অনুভব করবার শক্তি তার নেই বলেই সে তাদের এমন বিপদের দিনে এত চুলচেরা হিসাব করতে পারছে। ফলে, এই অবিচারের শাস্তিস্বরূপ সুব্রত রোগীর সমস্ত দায়িত্ব নিজের ওপর তুলে নিল। কয়েক-দিন পরে ভুবনবাবুর মা প্রবোধ মানলেন, হিমানীকেও সমস্ত সহ্য ক'রে অত্যাবশ্যক গৃহকর্মে মন দিতে হলো। কিন্তু পরিচর্যার ভার রইল সুব্রতের নিজের হাতেই। হিমানী কি অমূল্য যে মাঝে মাঝে শুশ্রূষা না করতে আসেন তা নয়, কিন্তু ভুবনবাবুর কিছু মনঃপূত হয় না। এ সব কাজে কোনো ত্রুটি সুব্রতও সহ্য করতে পারে না, হোক তা অপটুতাজনিত। রোগীর অসুবিধা অস্বাচ্ছন্দ্য তাতে তো আর কমে না। রোগী নিজেই অসহায়, আর কারো অসহায়তা সহ্য করবার শক্তি তার নেই।

সকলেই দেখা করতে আসেন। কলেজের সহকর্মীরা ছাড়াও ভুবনবাবুর বন্ধুবান্ধব প্রচুর। পাণ্ডিত্য তাঁকে আত্মকেন্দ্রিক করেনি; বরং বেশি মাত্রায় তিনি সামাজিক। সমাজের সকল স্তরের লোকের সঙ্গে তাঁর আলাপ। এত বই আর এত মানুষের সঙ্গে এক জীবনে এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় কি ক'রে উঠতে পারলেন তাই আশ্চর্য্য। তাঁর দাক্ষিণ্যে যাঁরা কৃতজ্ঞ তাঁদের ভিড়ও কম হয় না। বিশেষ ক'রে ছাত্রছাত্রীর দল। কতজনে তাঁর বাড়িতে থেকেই মানুষ হয়েছে, বই দিয়ে, অর্থ দিয়ে, বিনা বেতনে কি অর্ধ-বেতনে পড়বার সুযোগ দিয়ে কতজনকে তিনি

কতভাবে সাহায্য করেছেন। সবাই দেখা করতে চায়, কৃতজ্ঞতা সহানুভূতি জানাতে চায়। ভুবনবাবু ভিতরে ভিতরে ক্লান্তি বোধ করেন। কিন্তু তা প্রকাশ হতে দেন না। সবার সঙ্গেই হেসে দু'একটা কথা বলেন। উল্টে এদেরই ভরসা দেন। এরা এত ভয় পাচ্ছে কেন। কি আর এমন তাঁর হয়েছে। দু'দিনেই তিনি সেরে উঠবেন। আবার ক্লাসে আর খেলার মাঠে তাদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দেবেন। তাঁর জন্যে কোনো দুশ্চিন্তা যদি তারা করে তা হলেই বরং তিনি বেশি অস্বস্তি বোধ করবেন।

কিন্তু তাঁর ভয় আর আশঙ্কা, তাঁর অসহায়তা সুব্রতের কাছে গোপন থাকে না। গোপন করতে তিনি চানও না, সমস্ত দুর্বলতা প্রকাশ ক'রে তিনি সুব্রতের ওপর নির্ভর করতে চান। বলেন, 'আজকাল দুর্বল হতেই ভাল লাগে সুব্রত। এতদিন সকলের নির্ভরযোগ্য হতে পেরে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি আজ দেখছি কারো ওপর নির্ভর করবার আরামও কম নয়। আমি খুব স্বার্থপরের মত কথা বলছি বুঝি সুব্রত?'

সুব্রতের কাছে ভুবনবাবু আদর্শস্থানীয়। তাঁকে সামনে রেখে সুব্রত নিজের জীবন গঠন ক'রে চলেছে। তাঁর জীবনের ইতিহাস জয়ের ইতিহাস, সার্থকতার গৌরবে উজ্জ্বল। নিজের জীবনকে তিনি নিজের হাতে গঠন করেছেন। দৃঢ় অধ্যবসায়ে সমস্ত প্রতিকূলতা তিনি অতিক্রম করেছেন। কোনো মোহ কোনো বিভ্রম তাঁকে নিজের আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। আজ অসুস্থ হলেও তাঁর এই মানসিক বৈকল্যে সুব্রত ক্ষুব্ধ না হয়ে পারে না। তবু এ নিতান্তই আকস্মিক পীড়ার জন্য, এ বিহ্বলতা যে নিতান্তই সাময়িক তাও সুব্রত মনে মনে জানে।

ভিড় শুভাকাঙ্খী ও কৃতজ্ঞদের হলেও তা চিকিৎসকদের পরামর্শে

অবিলম্বে ভেঙে দিতে হোলা। তাতে রোগীর বিশ্রামের ব্যাঘাত হওয়ার আরো বেশি আশঙ্কা। এখন ভিড় রইল শুধু চিকিৎসকের। শহরের বড় বড় ডাক্তারদের জড়ো করা হোলো। কিন্তু কেউ তেমন ভরসা দিতে পারলেন না।

একদিন সকালে সুব্রত কি একটা কবিরাজী মালিস লাগাচ্ছে ভুবনবাবুর পায়ে, আস্তে আস্তে বাড়ির দরজায় কড়া নড়তে লাগল। ঠাকুর চাকর কে কোথায় আছে ব্যস্ত, অমূল্যও হয়তো কোথাও বেরিয়ে গিয়ে থাকবে। বাধ্য হয়ে সুব্রতকেই নেমে আসতে হলো নিচে। দোর খোলাই ছিল। সিঁড়ির গোড়াতে এসে অবন্তীকে দেখা গেল। সুব্রতকে দেখে সেও কড়া নাড়া বন্ধ ক'রে হাসিমুখে অপেক্ষা করছে।

সুব্রতই আগে কথা বলল, 'আপনি!'

সুব্রতের তৈলাক্ত দু'হাতে কটু মালিসের গন্ধ। সেদিকে একটু তাকিয়ে অবন্তী বলল, 'হ্যাঁ, আপনি কি বিস্মিত হচ্ছেন?'

সুব্রত অপ্রতিভভাবে বললে, 'না না, আপনারা এখানে ছিলেন না শুনেছিলাম।'

অবন্তী হেসে বল্‌লে, 'ঠিকই শুনেছিলেন। কালই আমরা শিলং থেকে এসে পৌঁছেচি। এসে শুনলাম ওঁর খুব অসুখ। কি ব্যাপার বলুন তো। চলুন দেখেই আসি।' একটু ইতস্ততঃ ক'রে অবন্তী বলল।

অবন্তী যেন অনুগ্রহ করছে। সুব্রত ভাবল বলে, 'থাক না, দেখাসাক্ষাৎ করা এখন ডাক্তারদের নিষেধ আছে।' কিন্তু বলতে হোলো, 'আচ্ছা চলুন।'

লঘু পায়ে অবন্তী তর্‌তর্‌ ক'রে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল—যেন কোনো রোগীকে সে দেখতে যাচ্ছে না, মজা দেখতে যাচ্ছে।

ভুবনবাবু ইজিচেয়ারের ওপর দু'পা টান ক'রে রয়েছেন, সুব্রত যেমন ভাবে রেখে গিয়েছিল। শুধু যে বইখানা বন্ধ ক'রে তিনি কোলের ওপর রেখে দিয়েছিলেন, সেখানা আবার খুলে নিয়েছেন। সুতরাং ঘরে ঢুকতেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন।

সুব্রত আড়াল ছেড়ে একটু সরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমাদের সঙ্গে পড়েন।'

ভুবনবাবু হেসে বললেন, 'চিনেছি, ইউনিভার্সিটিতে তো প্রায়ই দেখা হয়।' ইউনিভার্সিটিতে তাঁর দুটো ক্লাস আছে সপ্তাহে

অবন্তী বলল, 'হ্যাঁ নামটা আছে ওখানে?'

'শুধু নামই বা থাকবে কেন?' চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে ভুবনবাবু বললেন, 'বোসো। তোমার নাম অবশ্য অন্যত্রও শুনেছি।'

মুহূর্তের জন্য অবন্তীর চোখে একটু শঙ্কার ছায়া পড়ল। কিন্তু পর-মুহূর্তেই অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে তরলকণ্ঠে বলল, 'দুর্নাম নিশ্চয়ই।'

সুব্রত একটু বিস্মিত হোলো, ভুবনবাবুও। ক্লাসে তিনি অত্যন্ত রাশ-ভারী লোক। তাঁর কঠোরতা সকলেই জানে। কেউ কোনোরকম চাপল্য প্রকাশ করতে সাহসী হয় না তাঁর সামনে। কিন্তু মেয়েটির এই স্পর্ধায় ভুবনবাবু তেমন ক্ষুণ্ণ হলেন না, বরং আজ একটু প্রশ্রয় দিতেই যেন ভালো লাগলো। মৃদু হেসে বললেন, 'কি জানি, দুর্নাম কি সুনাম ভুলে গেছি।'

অবন্তী বলল, 'বাঁচলুম। ভুলে যাবার এমন মহৎ অভ্যাস খুব কম লোকেরই থাকে, না সুব্রতবাবু?'

ভুবনবাবু বললেন, 'কিন্তু তোমার নাম তো এখনো বললে না।'

'বলে কি লাভ, কোনো নামই যখন আপনার মনে থাকে না।'

এমন লঘু তারল্য ভুবনবাবু যেন আর কোনদিন উপভোগ করেননি, মনে হোলো তাঁর জরা আর জড়তা যেন অর্ধেক কমে গেছে।

বললেন, 'ও সেজন্য ভেবো না, মনে করিয়ে দেওয়ার লোক এখানে থাকবে।' বলে সুব্রতের দিকে একবার তাকালেন ভুবনবাবু। সুব্রতের সমস্ত মুখ তখন আরক্ত হয়ে উঠেছে। অবন্তীও সেদিকে চেয়ে দেখল। সুব্রতের এই মেয়েলি লজ্জা বেশ উপভোগ্য মনে হোলো তার কাছে। একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'সে ভয় করবেন না, এখানে ভুলে যাওয়াটাই সংক্রামক দেখছি, নইলে সুব্রতবাবু আমার নাম জানতেন বলেই তো ধারণা ছিল।'

আরো কিছুক্ষণ একথা ওকথার পর অবন্তী উঠে দাঁড়াল। বলে গেল এর পরের দিন সে বই নিয়ে আসবে। ছুটিতে মোটেই পড়াশুনো করেনি। এখন আরম্ভ না করলে পাশই করতে পারবে না। অবশ্য ভুবনবাবু আর সুব্রতবাবু যদি সাহায্য করেন তবে আর কোনো ভাবনা নেই।

ভুবনবাবু লক্ষ্য করলেন তাঁর রোগশয্যার পাশে এই প্রথম একজন এল, যে একবারও তাঁর অসুখের কথা তাঁকে মনে করিয়ে দিল না, তিনি যেন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ এমনভাবেই আলাপ ক'রে গেল। এতে যেন তিনি একটু আনন্দই বোধ করলেন। বললেন, 'মেয়েটি একটু প্রগলভা বটে, কিন্তু কী সাহস।'

সুব্রত তাঁর পায়ে আবার তেল মালিশ করতে আরম্ভ করেছিল, সংক্ষেপে জবাব দিল 'দুঃসাহস।'

ভুবনবাবু হেসে বললেন, 'তুমি একটি দুর্মুখ।'

তারপর থেকে অবন্তী মাঝে মাঝে আসে, বই খাতা নিয়ে আসে বলে তাদের বাড়ির সবাই ভাবে পড়তেই আসে, কিন্তু এবাড়ির সবাই জানে সে পড়তে আসে না, আসে গল্প করতে। কোনোদিন কারো রোগশয্যার ছায়াও সে মাড়ায়নি, কোনো আত্মীয়বন্ধুদেরও না। সেবা-শুশ্রূষা সে

কোনোদিন করতে জানে না, জীবনের এই দিকটাকে সে কোনোদিন বুঝতে পারেনি, বুঝতে চেষ্টাও করেনি। প্রথমত সুব্রতের হাবভাব তার কাছে হাস্যকর মনে হয়েছে। মাথা মুড়ে শিখা রাখলেই যেন ওকে মানাত। যেন একখানা মূর্তিমান কঠোপনিষৎ। তারপর তার এই মেয়েলি সেবা। এতেও সুব্রতের ওপর প্রথমত তার বীতস্পৃহা এসেছে। সে শুনেছে সুব্রতকে ভুবনবাবুই মানুষ ক'রে তুলেছেন। নিজের বাড়িতে রেখে পড়াশুনোর সম্পূর্ণ সুযোগ তিনিই ক'রে দিয়েছেন। না হলে সুব্রতকে হয়তো নিরক্ষর হয়ে থাকতে হোতো। সম্পর্কে সুব্রত ভুবনবাবুর দূরসম্পর্কের এক ভাগিনেয়, কিন্তু এখন এমন নিকটতম আত্মীয় পরস্পরের আর কেউ নেই। তবু এই পরিচর্যার প্রণালীটা কিছুতেই অবন্তীর মনঃপূত হয়নি। পুরুষের কৃতজ্ঞতা এমন হবে কেন, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্যেও পৌরুষ থাকবে। সে নিজে কেন এমন কপালে হাত বুলিয়ে দেবে, পা-মালিশ করবে। অগাধ অর্থ উপার্জন করুক না সুব্রত, রেখে দিক চার পাঁচটা নার্স। আরো প্রচুর অর্থ ব্যয় করুক চিকিৎসার জন্য।

তবুও অবন্তীর সুব্রতকে কেন যেন ভালো লাগে। সুব্রতর মধ্যে কি যেন এক আকর্ষণের জিনিস আছে। অবন্তী মনে মনে জানে তা কী। সে সুব্রতের সৌন্দর্য। ওর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে অবন্তীর মনে হয়—সুব্রতকে সবই মানায়। যে সুন্দর, তার সংস্পর্শে যাই আসুক তাই তার অলংকার হয়ে ওঠে। ভুবনবাবুর পায়ে মালিশ করাটাও এখন ওর পক্ষে অশোভন মনে হয় না। সে যখন সংযমের কথা বলে, আধুনিক রীতিনীতির নিন্দা করতে থাকে—তখনো অবন্তীর তেমন ক্ষোভ হয় না। ও যাই বলুক—অদ্ভুত ওর কথা বলার ভঙ্গি। আর দেহের সৌন্দর্য তো শোনার জিনিস নয়, তা দেখবার, স্পর্শ করবার।

স্পর্শ সে করেছে সুব্রতকে—এ সম্বন্ধে অবন্তীর দৃঢ় বিশ্বাস আছে মনে। সুব্রতকে চমৎকার না লেগে পারে না। ও যাই হোক, যত পুরোনো আর পুরাণের কথাই বলুক না—ও নতুন ও সম্পূর্ণ নতুন। জীবন সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতাই ওর নেই। সামান্য কথায়, সামান্য ইঙ্গিতে, সামান্য স্পর্শে ও আরক্ত হয়ে ওঠে। ওর সংস্পর্শে এলে অবন্তীর মনে হয়, তারো যেন এই আরম্ভ। সমস্ত অভিজ্ঞতা যেন তার স্মৃতি থেকে ধুয়ে গেছে। একথা অবশ্য অবন্তীর আরো অনেকবার মনে হয়েছে। চমৎকার এই ভালোবাসা, ভোরের সূর্যের মত সুন্দর আর নতুন, পুনরাবৃত্তিতে যার কোনো ক্লান্তি নেই।

সুব্রত সুন্দর। তাই তো যথেষ্ট। মতের সঙ্গে নাই বা মিলল। কি হবে মত আর মন দিয়ে যতক্ষণ চোখ আছে। সৌন্দর্যবিদের মূল্যেই মূল্যবান মত অপর তত্ত্বের মাপ কাঠি দিয়ে একে মাপা যায় না। কিন্তু সুব্রত কেন এত প্রচ্ছন্ন রাখে নিজেকে? ও কেন কথা বলে না? নাই বা বলল কথা! কথা তো অবন্তী অনেক শুনেছে, অনেক বলেছে। আজ মনে হয়, ভাষার চেয়ে আভাস অনেক ভালো। অনেক সুন্দর প্রকাশের চেয়ে অপ্রকাশ। প্রকাশ বড় সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ, অপ্রকাশের মধ্যে আছে বিচিত্র সম্ভাবনার ঐশ্বর্য।

কিন্তু সুব্রত কথা না বললে কি হবে, ভুবনবাবুকে কথার নেশায় পেয়ে বসেছে। অবশ্য কথা বলতে ভুবনবাবু চিরকালই ওস্তাদ, ক্লাসে তাঁর বক্তৃতা খুব মনোজ্ঞ হোতো, বন্ধু মহলে যে কোনো বিষয় নিয়েই তিনি আলাপ করতেন, তাই উপভোগ্য হয়ে উঠত। অথচ তাতে তাঁর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য কিছুমাত্র শিথিল হোতো না। নিজেকে উপভোগ্য করবার জন্য লঘু তারল্যের আশ্রয় না নিলেও তাঁর চলত।

কিন্তু এখন ভুবনবাবু যেন বদলে যাচ্ছেন, কথাবার্তায় খানিকটা লঘুতা তিনি ইচ্ছা করেই আনেন। কথার তারল্যে নিজের জরাকে যেন ভাসিয়ে নিতে চান। নিজের শক্তির সীমা যেন তিনি জেনে ফেলেছেন। কথা, কথাই এখন তাঁর একমাত্র সম্বল। শুধু কথার মধ্যে দিয়েই নিজেকে তিনি উপভোগ্য করবেন, উপভোগ করবেন।

সেদিন আধুনিক প্রসাধনের সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল। ভুবনবাবু বললেন দেখ, যত গোঁড়া আর যত বুড়োই হই তোমাদের সাজসজ্জা মনে মনে আমি পছন্দই করি। আর কিছু না হোক এ যুগে প্রসাধনের সাধনায় তোমরা সিদ্ধিলাভ করেছ। আজকালকার প্রসাধনে সেকালের ভারি অলংকার নেই, কিন্তু অহংকার আছে।

অবন্তীর প্রসাধনে সেদিন একটু বিশেষ পারিপাট্য ছিল। মুহূর্তের জন্য তার মুখে আরক্ত সলজ্জ আভাস ফুটে উঠল, কিন্তু পরের মুহূর্তেই তার স্বাভাবিক প্রগলভতার সঙ্গে বলল, এই স্বীকৃতিতে সমস্ত গোঁড়ামি আর বুড়োমির দুষ্কৃতি থেকে আপনি রেহাই পেলেন।

ভুবনবাবু বললেন, কিন্তু গোঁড়ামিকে যত সহজে ঝেড়ে ফেলা যায়, বুড়োমিকে তেমন পারা যায় না। তা দেহের সঙ্গে লেগে থাকে। তাঁর কণ্ঠস্বরে কেমন যেন একটু করুণ অসহায়তার সুর বেজে উঠল।

এক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বলল না। একটু চুপ ক'রে থেকে ভুবনবাবু নিজেই নিজের প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু ওটা শুধু দেহের সঙ্গেই থাকে, মনের সঙ্গে নয়। মনের বয়স বাড়া মানে বার্ধক্য নয়, বৃদ্ধি। বার্ধক্য কথাটা বোধ হয় বৃদ্ধি থেকেই এসেছে। একেই বলে শাব্দিক পরিহাস।

কোনো কথা বলছ না যে অবন্তী?

শব্দতত্ত্বে স্তব্ধ হয়ে বসে আছি। অবন্তী একটু হাসল।

ভুবনবাবু যেন একটু ক্ষুণ্ণ হলেন, কিন্তু হার মানলেন না, বললেন 'শুধু শব্দতত্ত্ব কেন, কোনো তত্ত্বই তোমাদের ভালো লাগে না। তোমরা আজ কাল বড় লঘুচেতা হয়ে গেছ। শুধু তথ্য খুঁজে বেড়াও, কি বল সুব্রত?'

সুব্রত বলল, 'নিশ্চয়ই—আমারও তাই মত।'

সুব্রত আর কিছুই বলতে পারল না। অথচ ভুবনবাবুর সাথে তার মতৈক্যের কথা ছাড়া এ সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু বলবার ছিল। সে এ সব সম্বন্ধে নতুন ক'রে ভেবেছে, নতুন পদ্ধতিতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছে। এ যুগ নিজের অক্ষমতাকে ক্ষমতা বলে অত্মপ্রসাদ লাভ করে। সত্যকে মঙ্গলকে এ যুগ পুরোনো বলে অবজ্ঞা করে। কারণ, তাকে নতুন রূপ দেওয়ার সাধ্য তার নেই, নতুন ক'রে সৃষ্টি করার শক্তি তার লোপ পেয়েছে। কিন্তু সুব্রতের ভাষায় যা প্রকাশ পেল তা কত হাস্যকর; তা নিতান্ত ছেলেমানুষের মত হোলো। কথা বলতে সুব্রত কখনো পারে না। ছেলেবেলায় ভাষা ফুটতে তার অনেক সময় লেগেছিল। অনেকেই ভেবেছিল, সে বুঝি বোবাই হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথা বলতে যদি বা শিখল, বেশি কথা বলতে কিছুতেই শিখল না। অতি সংক্ষেপে নিজের প্রয়োজনকেই শুধু সে ভাষায় কোনো রকমে প্রকাশ করতে পারে, অপ্রয়োজনীয়তার আনন্দ সে উপভোগ ক'রে শুধু চিন্তায়। মনে মনে কথা বললে নিজের অক্ষমতার সঙ্গে সুব্রত প্রায়ই আপোষ ক'রে নিয়েছে। নিজের স্বভাবের সঙ্গে কতকাল আর লোক যুঝতে পারে। ভুবনবাবুর কথা বলবার শক্তিতে সুব্রত চমৎকৃত হয়, তার ঈর্ষা হয় না, হয় আনন্দ। সুব্রতের আদর্শ যেমন তাঁর মধ্যে রূপ পেয়েছে তেমনিই তার ভাষা ভুবনবাবুর কণ্ঠে। সব সময় তাঁর কথার সঙ্গে সুব্রতের অবশ্য মেলে না, কিন্তু তাঁর অনেক কথার মধ্যেই সুব্রত যেন নিজেকেই প্রকাশিত দেখতে পায়। বিশেষ ক'রে অবন্তীর সঙ্গে তাঁর এই কথোপকথন সুব্রতের বেশ

উপভোগ্য লাগে। অবশ্য মাঝে মাঝে মামার চপলতায় সুব্রত কিছু ক্ষুব্ধ হয়, একটু হয় তো লজ্জিতও বোধ করে, যেমন সে নিজের চাপল্যের জন্ত করত। কিন্তু লজ্জা এবং ক্ষোভ ছাড়া এই লঘুতায় কোথায় যেন একটু লোভও আছে। বিশেষ ক'রে ভুবনবাবু যখন তার সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেন। তাঁর এ ধারণার সূক্ষ্ম পরিহাসে বিরক্ত হওয়ার চেয়ে সুব্রত মনে মনে একটু আমোদই বোধ করে।

কিন্তু অবন্তী সুব্রতের মত নয়, অপ্রয়োজনীয় বহু কথা সে বলতে পারে, বহু কথা সে বলতে ভালবাসে। একটু হেসে অবন্তী বলল, তাই নাকি? কিন্তু আমার তো মনে হয়, আপনি নিজের আসল মত লজ্জায় গোপন ক'রে যাচ্ছেন। তারপর ভুবনবাবুর দিকে চেয়ে বলল, কিন্তু তথ্য আর তত্ত্বের মধ্যে কোনো অহিনকুলের সম্বন্ধ আছে বলে আমার মনে হয় না। তথ্যের পথে আমরা তত্ত্বে পৌঁছি। কিন্তু আপনারা পথের কষ্ট স্বীকার করতে রাজী নন, তথ্যহীন কল্পনাতেই আপনাদের আনন্দ।

বিতর্ক কতক্ষণ চলত বলা যায় না। এই সময় হিমানী এলেন ঘরে। তাঁর দ্রুত নিঃশ্বাস পতনের শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়। ওঠানামা করতে আজকাল একটু কষ্টই হয়। সিঁড়ি ভাঙ্গবার পক্ষে একটু যেন বেশিই মোটা হয়ে পড়েছেন হিমানী। একটু দম নিয়ে বললেন, 'এই যে অবন্তী, কেমন আছ, কখন এসেছ জানতেও পারিনি, নিচ থেকে ওপরের খোঁজ-খবর নিতে পারারও কথা নয়।'

অবন্তী বলল, 'অন্তত ঘুমিয়ে থাকলে তো নয়ই, আপনার ঘরের সামনে দিয়ে আসতে আসতে দেখলাম, আপনি নাক ডেকে ঘুমোচ্ছেন।'

হিমানী প্রতিবাদ করলেন, 'আমার কখনো নাক ডাকে না।'

অবন্তী হেসে বলল, 'ডাকলেও তা আপনার শুনতে পাওয়ার কথা নয়।'

বিরক্তির ভঙ্গিতে হিমানী মুখ ফেরালেন, সুব্রতকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'তারপর এবেলা পথ্যের কি ব্যবস্থা? উনি তো ওবেলা আমাকে শাসিয়েছেন—'

সুব্রত নির্মম এবং নিরপেক্ষ ভঙ্গিতে জবাব দেয়, 'উহুঁ লুচি।'

ভুবনবাবু কাতরভাবে বলেন, 'দোহাই তোমাদের আমি গরীবের ছেলে। ও সব বড়লোকের খাদ্য আমার রোজ মুখে রুচবে না। আমার জন্যে দুটো ডাল ভাতেরই ব্যবস্থা করো।'

সুব্রত বলল, কিন্তু 'আজ যে পূর্ণিমার রাত সে কথা কি ভুলে গেছেন?'

ভুবনবাবু বললেন, 'মনে রেখেই বা কি লাভ।'

অবন্তী এবার উঠে দাঁড়ায়, 'চলুন সুব্রতবাবু একটু এগিয়ে দেবেন।'

সুব্রত কিছু বলবার আগেই ভুবনবাবু বলে ওঠেন, 'নিশ্চয়ই, হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাও সুব্রত, এগিয়ে দিয়ে এসো।'

উৎসাহের আধিক্যে মনে হয়, ভুবনবাবু যেন নিজেই যাচ্ছেন।

ওরা চলে গেলে ভুবনবাবু হঠাৎ বলেন, 'অবন্তীর সঙ্গে সুব্রতের বিয়ে হলে কেমন হয়!'

'তুমি অবাক করলে। ঐ ফাজিল মেয়েটার সঙ্গে?' হিমানী বিরক্তির স্বরে জবাব দেন।

'কিন্তু পড়াশুনোয় মেয়েটি খুব ভালো।'

হিমানী এবার গম্ভীর হয়ে যান। পড়াশুনোওয়ালা মেয়ের ওপর ভুবনবাবুর চিরদিনের পক্ষপাতের কথা হিমানীর মনে পড়ে যায়। অথচ ভুবনবাবু কোনোদিন হিমানীর স্বল্পশিক্ষার জন্য প্রকাশ্যে কোনো ক্ষোভ করেননি, হিমানীকে কোনো অবহেলা অনাদর করেননি, বলতে গেলে দীর্ঘ দাম্পত্য-জীবন তাঁদের সুখেই কেটেছে। কিন্তু মেয়েদের শিক্ষার যখনই প্রশংসা করেন ভুবনবাবু তখনই হিমানীর মনে যেন কেমন ক'রে ওঠে। ভুবনবাবুর গোপন ক্ষোভ যেন আর প্রচ্ছন্ন থাকে না। সমস্ত শিক্ষিতা মেয়েদের

করিনি, মিষ্টান্নের খরচ বাঁচাবার মতলব বোধ হয় গোড়া থেকেই ছিল, না হলে একটা খবর অন্তত দিতে পারত। বা, বসুন না, দাঁড়িয়ে রইলেন যে।'

মাধুরী নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সব চেয়ে দূরের চেয়ারটায় গিয়ে বসল। রমেনের বন্ধুদের তার ভাল লাগে না, এরা যেন কেবল যাচাই করবার জন্যে আসে তার কতটুকু বিদ্যা, কতটুকু বুদ্ধি, কতটুকু রূপ। বিয়ের চার-পাঁচ বছর আগে থাকতে এই যে যাচাই-বাছাই আরম্ভ হয়েছে, এর যেন শেষ নেই। ভেবেছিল বিয়ে হয়ে গেলে আর এসব বালাই থাকবে না, কিন্তু ব্যাপারটা ইদানীং যেন আরও বেড়েছে। স্বামীর নিত্য নতুন বন্ধু আসবে আর তাদের সামনে ভেবেচিন্তে ওজন ক'রে ক'রে কথা বলতে হবে, জবাবটা একটু কাঁচা হয়ে গেলেই স্বামীর মান যায়, মন পাওয়া যায় না।

রমেন একেকদিন স্পষ্টই বলে, 'মানুষের সঙ্গে কথা বলতেও শেখনি।'

মাধুরী রাগ ক'রে জবাব দেয়, 'না শিখিনি তো, তার হবে কি। আমি লেখাপড়া শিখিনি, দেখতে ভাল না, এ কথা তো সব বন্ধুকেই তুমি বলে দিয়েছ, তবে আর তোমার লজ্জা কিসের? এতই বলেছ আর একটু বাড়িয়ে বলতে পারলে না আমার বউ বোবা, একেবারেই কথা বলতে পারে না, তাহলে তুমিও বাঁচতে আমিও বাঁচতুম।'

মাধুরীর কথার ঝাঁঝে তখনকার মত রমেন নিজেই বোবা হয়ে যায়।

নমস্কার বিনিময়ের পর একটু চুপ ক'রে রইল ভবতোষ। কি কথা বলা যায় এর সঙ্গে। তারপর একটু ভেবে বলল, 'কই আমার কথার জবাব দিলেন না?'

একটু যেন চমকে উঠল মাধুরী, 'কোন কথার?'

'মিষ্টান্ন থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম কেন ?'
'ও, তা আমি কি জানি ?'
'কিচ্ছু জানেন না ?'
'নিশ্চয়ই আপনাদের ভাগ্যে ছিল না।'
ভবতোষ একবার রমেনের মুখের দিকে তাকাল। স্ত্রীর এমন নির্ব্বোধ জবাবে তার মুখ হতাশায় ম্লান।
ভবতোষ বলল, 'যা বলেছেন। আমাদের ভাগ্যই খারাপ। রমনের কিন্তু ভাগ্য ভালো।'
'কেন, একথা বলছেন যে ?'
'কেন বলছি তা নিশ্চয়ই আপনি জানেন।'
ভবতোষের দিকে তাকাতেই মাধুরী সলজ্জে চোখ নামাল।
'আপনি ঠাট্টা করছেন, এতো সবাই জানে, আমাকে ওঁর পছন্দ হয়নি।'
'এই সব বুঝি ও বলে বেড়ায় ?'
'বলেই তো, সকলের কাছেই বলে।'
'কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না। ওর মুখের কথা আর মনের কথা এক নয়। স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে যে ভালবাসে এ কথা বন্ধুদের কাছে অস্বীকার করতে তারা কম ভালবাসে না।
'তাই নাকি ? আপনি জানলেন কি ক'রে ? বিয়ে করেছেন বুঝি ?'
উঁহুঁ ঠিক ধরতে পারলেন না। 'এ সব কথা লোকে বিয়ে করার আগে শেখে আবার বিয়ে করার পরে ভুলে যায়।'
মাধুরী হেসে বলল, 'আপনার সঙ্গে কথায় পারবার জো নেই। যাই চা ক'রে নিয়ে আসি।'
ভবতোষ বলল, 'আর আপনার কাছে কথা গোপন করবার জো নেই।

ওপর হিমানীর ঈর্ষা হয়, রাগ হয়। মনে মনে স্বামীকেও তিনি ক্ষমা করতে পারেন না। তাঁর এই পক্ষপাতিত্ব, এই প্রচ্ছন্ন ক্ষোভ হিমানীর কাছে প্রায় বিশ্বাসঘাতকতার সামিলই মনে হয়।

কিছুক্ষণ পরে হিমানী চুপচাপ উঠে চলে যান। ছোট মেয়েটা খেতে বসে কি নিয়ে কোন্দল করছে, ভারি আবদার বেড়েছে মেয়েটার।

হিমানীর কালো, মোটা, সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে নেমে যেতে থাকা স্থূল শরীরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ভুবনবাবুর নিজেকে অত্যন্ত বঞ্চিত মনে হয়। তিনি যেন উপবাসী রয়ে গেছেন, বুভুক্ষু রয়ে গেছেন, যৌবনে যেন তিনি কোনোদিন কিছু উপভোগ করেননি। অলক্ষ্যে কখন প্রৌঢ়ত্ব এসে পড়েছে। আর সম্পূর্ণ বুড়ো হবার আগেই এল দুর্দৈবের পঙ্গুত্ব। এই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শময় পৃথিবী তাঁর কাছে যেন অনাস্বাদিত রয়ে গেল। বিগত দীর্ঘ দাম্পত্যজীবনের দিনগুলির মধ্যে একটি উদ্বেল রঙীন মুহূর্তের কথাও আজ তাঁর মনে পড়ল না। বিশ বছর যেন একটানা কেবল একটা অভ্যাসের মধ্যে কেটেছে। নিতান্তই একটা শারীরিক অভ্যাস, আর কিছু নয়।

মনে মনে সঙ্কল্প করলেন ভুবনবাবু যেমন করেই হোক অবন্তীর সঙ্গে সুব্রতের বিয়ে তিনি দেবেনই। হিমানীর কোন বাধা তিনি মানবেন না। অনেক তো মেনেছেন আর কেন?

স্বখাত

অমৃতসরে চাকুরি উপলক্ষে মাস কয়েক প্রবাস জীবন কাটিয়ে এসে বন্ধু রমেনকে দেখে ভবতোষ অবাক হয়ে গেল। মুখে সেই প্রসন্ন হাসি নেই, মনে নেই আনন্দ। অবশ্য ইতিপূর্বে অন্য বন্ধুদের চিঠিপত্রে খবর কিছু কিছু সে পেয়েছিল। বাপের পাল্লায় পড়ে রমেনকে কালো এবং নিরক্ষরাপ্রায় মেয়েকে বিয়ে করতে হয়েছে। কিন্তু বউয়ের রঙ কালো বলে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায়, এমন ছেলেও যে এযুগে থাকতে পারে রমেনের মুখ না দেখলে তা ভবতোষের বিশ্বাস হোতো না। সমস্ত ঠাট্টা পরিহাসের উত্তরে রমেন কোনো জবাব না দিয়ে কেবল ম্লান হাসে। বাল্যবন্ধু মিতভাষী রমেনের এই হাসিতে এমন একটু বেদনার আভাস থাকে যা, ভবতোষের সিনিক মনকেও স্পর্শ না ক'রে পারে না। দুঃখটা তার কাছে যত লঘুই মনে হোক রমেনকে যে তা গভীরভাবে আচ্ছন্ন ক'রে ধরেছে, এ কথা ভবতোষ মনে মনে টের পায়।

রমেনের বাবা নিবারণবাবু একদিন নিজেই এলেন ভবতোষের ওখানে। পরম অন্তরঙ্গ সুরে বললেন, 'তুমি এসেছ বাবা ভবতোষ, আমি এবার সত্যিই নিশ্চিন্ত হয়েছি। ছেলেবেলা থেকেই তোমার কথা ও মেনে চলে, ওর অসীম নির্ভর তোমার ওপর। আর সব বন্ধুরা ক্ষেপিয়ে ওর আরো মাথা খারাপ ক'রে দিয়েছে। তুমি একটু

ওকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে-সুজিয়ে বলো, এমন করলে লোকে কি মনে করবে।'

'কেন, কি করে?'

'না, করেও না কিছু বলেও না কিছু, সেই তো হয়েছে আরো মুস্কিল। ওর ওই ভূতান্তরিত ভাব দেখেই তো আমার হৃদয় ফেটে যায়। আর ওই নিরপরাধ কচি মেয়েটার মনই বা কেমন করতে থাকে বল তো?'

'সে তো সত্যিই, কিন্তু বউ একটু দেখে শুনে আনলেই পারতেন।'

নিবারণবাবু চটে উঠলেন, 'আবার কি দেখে শুনে আনব? সদ্বংশের ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে, লেখাপড়াও মোটামুটি জানে, দেখতে শুনতেও কুশ্রী বলা চলে না, আবার কি? তোমাদের যে একেবারে বি এ, এম এ, পাশওয়ালা অসামান্যা রূপসী না হলে পছন্দ হবে না, তা কি ক'রে জানব?'

'তেমন পছন্দটাকে কি আপনি খুব খারাপ মনে করেন?'

'খারাপ নয় তো কি? ঘরের স্ত্রী খুব রূপসী আর বুদ্ধিমতী হওয়াই কি ভালো?'

ভবতোষ হাসল, 'তাহলে তিনি বেশি দিন আর ঘরে থাকেন না, এই তো আপনার আশঙ্কা?'

একমুহূর্ত ক্রুদ্ধ-বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে থেকে নিবারণবাবুও অদ্ভুত একটু হাসলেন, 'না বাবা ভয় সে জন্য নয়, ঘরেই তিনি থাকেন কিন্তু পুরুষের বিদ্যাবুদ্ধি কাণ্ডজ্ঞান সমস্ত হরণ ক'রে একেবারে সর্বময়ী হয়ে থাকেন, স্বামীর আর স্বামিত্ব থাকেনা।'

নিবারণবাবু বিদায় নিলে ভবতোষ মনে মনে না হেসে পারল না। কত রকম দুঃখই যে আছে সংসারে। তার নিজের সমস্যা অবশ্য একটু ভিন্ন

ধরনের। স্নেহের আতিশয্যে তার বাবা তার ঘাড়ে একটি বউ গছিয়ে দিয়ে যাননি বটে কিন্তু অপরিমেয় দেনায় আর অসংখ্য পোষ্যে দাঁড়ির দুই পাল্লা সমান ক'রে রেখে গেছেন। দুটি বোনেরই বিয়ের বয়স প্রায় অতিক্রান্ত হতে চলেছে। অবশ্য সেজন্য ভবতোষের খুব বেশি আফশোষ নেই, কেননা কোনো বয়সেই মেয়েরা আজকাল আর অরক্ষণীয়া নয়। কিন্তু পাড়ার ছেলেগুলি ওদের প্রেমে পড়বার জন্য নাকি অত্যন্ত ঔৎসুক্য দেখাচ্ছে। তার মধ্যে দু'একটি সবর্ণের ছেলেও আছে। অবশ্য অসবর্ণ হলেও আপত্তি ছিল না, কিন্তু সকলেই প্রেমে পড়বার জন্যে যেমন উৎসুক বিয়ে করবার জন্যে তেমন নয়। কেননা, এ সব যুদ্ধসংক্রান্ত অস্থায়ী চাকরীতে স্থায়ীভাবে কোনো মেয়ের ভরণপোষণের ভার নেওয়ার ভরসা হয় না, তার বদলে ছোটখাট উপহার দিয়ে কিংবা দু'এক সন্ধ্যা সিনেমা দেখিয়ে সাময়িক প্রেমিক হতেই সাধ যায়। সেজো ভাইটি আছে মেসোপটে-মিয়ায়। মাস কয়েক ধরে তার খোঁজখবর নেই, সাংসারিক কাজ কর্মের অবসরে মা ইতিমধ্যেই তার জন্যে ডুকরে ডুকরে কাঁদা আরম্ভ করেছেন। দুশ্চিন্তা এবং ভ্রাতৃবাৎসল্য ভবতোষের মনেও আছে, কিন্তু তবু কেন যে মায়ের কান্না শুনলে দুঃসহ বিরক্তিতে তার সমস্ত শরীর রি-রি করতে থাকে তা কে বলবে। চাকুরিস্থানেও শনি বক্রভাবে অবস্থান করছেন, ওপরওলাদের সঙ্গে বনিবনাও হচ্ছে না। অথচ ফস ক'রে ছেড়ে দেওয়ার মত অবস্থাও নয়।

এ সব দুঃখের কোনোটিই নিবারণবাবু কিংবা তাঁর একমাত্র ছেলে রমেনের নেই। কলকাতায় বাড়ি আছে, সওদাগরী অফিসে আছে স্থায়ী চাকুরী। পোষ্যের সংখ্যা স্বল্প। তবু এঁদের মনেও দুঃখের অভাব নেই। নিবারণ-বাবুর ছেলের মুখে নেই হাসি আর তাঁর ছেলের বউয়ের গায়ে নেই দুধে আলতার রং। কিন্তু রং তো থাকারই কথা ছিল। হয় তো নিবারণবাবুর

এতক্ষণ ধরে প্রাণটা চা-চাই করছিল বটে,—কি ক'রে বুঝতে পারলেন বলুন তো ?'

মাধুরী দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে একবার ফিরে তাকিয়ে বলল, 'ও আমরা বুঝতে পারি।'

সে ঘর থেকে চলে গেলে ভবতোষ রমেনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চমৎকার মেয়ে, আমার তো বেশ লাগল।'

রমেন বলল, 'তুমি ঠাট্টা করছ।'

ভবতোষ বলল, 'হুঁ, আমি ঠাট্টা করবার আর মানুষ পেলাম না, কতবড় রসবোধ তোমার যে, তোমার সঙ্গে আমি ঠাট্টাপরিহাস করতে যাব। একটু কাণ্ডজ্ঞান থাকলে কি এই বউকে কেউ খারাপ বলে ?'

বন্ধুর তিরস্কারে ক্ষুব্ধ হওয়ার চেয়ে মনে মনে যেন একটু খুসিই হোলো রমেন, কিন্তু তুমি ওর মধ্যে কী এমন দেখতে পেলে বল তো ?'

বন্ধুর মনে আনন্দের আমেজ লেগেছে দেখে ভবতোষ মনে মনে হাসল, তারপর বলল, 'সে যদি আমার দুটো চোখ তোমাকে ধার দিতে পারতাম তা হলে বুঝতে। কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয়, তাই আমি এক মুহূর্তে যা দেখলাম জীবনের বিভিন্ন মুহূর্তে একটু একটু ক'রে তোমাকে তাই দেখাতে হবে।'

রমেন বলল, 'তোমার সব কথাতেই হেঁয়ালী।'

হেঁয়ালীই বটে। কিন্তু বেশ লাগে মাঝে মাঝে এমন হেঁয়ালী করতে। বিশেষত জীবনটা যখন এত কাঠখোট্টা, এত নীরস, একেবারে জলের মত পরিষ্কার আর জলের মত পান্‌সে, তখন মাঝে মাঝে চেষ্টা ক'রে যদি একটু দুর্বোধ্য হেঁয়ালীর ছোঁয়াচ তাতে লাগাতে পারা যায় মন্দ কি। আর তো কিছু করবার শক্তি নেই, কোনো দিক থেকেই জীবনটাকে একটু মোড়

ফেরান যায় না ; কেবল যত ইচ্ছা যত খুশি বানানো যায় কথা, আর সেই মনগড়া কথা দিয়ে কেবল ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া যে-জীবনকে যে-জগৎকে কিছুতেই গড়ে নেওয়া গেল না।

তারপর থেকে ভবতোষ প্রায়ই আসে রমেনদের বাড়ি। চা খায় আর কথা বলে ; অফিস আর সংসারের ঝামেলার ফাঁকে ফাঁকে অবসরটা বেশ কাটে। এ যেন একাধারে তার খেলা আর কর্তব্য! দাম্পত্যজীবনে সুখী করতে হবে বন্ধুকে। সাধারণ আটপৌরে স্ত্রীকে প্রেয়সী বানিয়ে তুলতে হবে।

নিজের শক্তির পরিচয়ে ভবতোষ নিজেই বিস্ময় বোধ করে, কোনোদিন কাব্যচর্চার ধার সে ধারেনি, নিতান্ত কাঠখোট্টা বস্তু-জগতের মানুষ। ছেলেবেলা থেকেই নানা দুঃখ-দারিদ্রের সঙ্গে যুঝে আসতে হয়েছে। নরম ভাবালুতা তার ধাতে নেই। কিন্তু দরকার হলে সেও যে এমন বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে পারে তা কে জানত ?

মাধুরী সম্বন্ধে তার বাছা বাছা চমকপ্রদ বিশেষণগুলিতে রমেন খুশি হয়, চাপা লজ্জায় আর আনন্দে মাধুরীর শ্রীহীন সৌন্দর্যহীন ভোঁতা মুখও সুন্দর দেখায় ; কিন্তু সব চেয়ে খুশি হয় ভবতোষ নিজে। এক একটি ধারালো শব্দ তার মুখ থেকে খসে পড়ে আর তার ঔজ্জ্বল্যে সমস্ত পৃথিবী যেন জ্বলজ্বল করতে থাকে।

অফিসের ফাইলের পাতা উল্টাতে উল্টাতে কিংবা কোনো সুপিরিয়র অফিসারের সামনে, হয়ত বা মায়ের সঙ্গে কোনো বৈষয়িক পরামর্শ করবার সময়—নিতান্ত অস্থানে অসময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে কখন যে একেকটি কথা মনের ভিতর থেকে নীল পদ্মের মত ভেসে ওঠে তার ঠিক নেই, আর সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের সমস্ত প্রতিকূলতা অতিক্রম ক'রে মন প্রসন্ন মাধুর্যে

নিজের ব্যক্তিগত আদর্শে আর কিঞ্চৎ আর্থিক আসক্তিতে সে রংকে কিছু নিষ্প্রভ হতে দিয়েছেন। আর ভীরু মুখচোরা রমেন জাঁদরেল বাপের সামনে যেমন মাথা তুলতে পারেনি, তেমনি ভুলতে পারছে না অর্ধশিক্ষিতা সাধারণ একটি বাঙালী মেয়ের পতিত্ব বন্ধু-সমাজ তাকে পতিত ক'রে রেখেছে। আসলে স্ত্রীর শিক্ষা এবং রূপ তো স্বজন-বন্ধুদের কাছে আত্মমর্যাদা বাড়াবার জন্যেই। দামী ঘড়ির মত, রুচিসম্মত আসবাবের মত, স্ত্রীও যদি বন্ধুদের সপ্রশংস ঈর্ষা জাগাতে না পারল, তবে আর তার সার্থকতা কি! মনে মনে হাসল ভবতোষ।

পরদিন ভবতোষ রমেনের লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে উপস্থিত হোলো, এবং তার স্ত্রী ও শ্বশুরকূল সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিল। খড়দয়ের বিখ্যাত নিত্যানন্দ পরিবারের মেয়ে। সমস্ত পূর্ববংগে ওঁদের শিষ্যসেবকেরা ছড়িয়ে আছে, তাদের পারমার্থিক বিধিব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের আর্থিক সংস্থান সকলেই অল্পবিস্তর ক'রে গেছেন। রমেনের শ্বশুর কিছু ইংরেজী শিক্ষা পেয়ে পৈতিক সম্পত্তিটুকুই কেবল গ্রহণ করেছেন। শিষ্যমহল অন্য সরিকদের কাছে বিক্রি ক'রে দিয়ে মহকুমা শহরের আদালতে পেস্কারী নিয়েছেন; বয়সের সময় রোজগার নিতান্ত কম করেননি, পৈতৃক তালুক এবং খামার দুই-ই কিছু কিছু বাড়িয়েছেন।

এক পুরুষে এ কালের আদবকায়দায়ও নিতান্ত কম অগ্রসর হননি। মেয়েকে ইংরেজী স্কুলের থার্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়িয়েছেন। দু'একখানা রবীন্দ্রসংগীত শিখিয়েছেন এবং স্বামীর বন্ধুবান্ধব দেখলে যে, এক হাত ঘোমটা টানতে হয় না এটাও সে বাপের বাড়ি থেকেই শিখে এসেছে।

সব তথ্য একে একে সরবরাহ ক'রে রমেন বলল, 'সুতরাং বুঝতেই পারছ ভবতোষ পিতৃদেবের অভিমতে আফশোষের আমার আর কোনো কারণ থাকতে পারে না।'

ভবতোষ বলল, 'সেটা কেবল পিতৃদেবের অভিমত তাই বা ভাবছ কেন, যাই হোক, বউতো আগে দেখাও। তারপরে বিচার ক'রে দেখব, আক্ষেপ যথার্থই তোমার কর্তব্য কিনা।'

'আচ্ছা, তাহলে তোমার রায়ের প্রতীক্ষাতেই রইলাম।'

রমেনের ন'দশ বছরের একটি বোনের সঙ্গে তার স্ত্রী এলো ঘরে। ভবতোষ আড়চোখে দেখে নিলে মেয়েটিকে, অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হলো একেবারে সোজাসুজি তাকালেও ক্ষতি ছিল না। রমেনের বিনয় যে এমন নির্মমভাবে সত্য তা যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। বছর আঠারো-উনিশ হবে বয়স। আর এই বয়সের যৌবনটাই একমাত্র উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পুরুষের চোখে মেয়েদের যৌবন যথেষ্ট নয়; তার ওপর নিজের শ্রেণীগত শিক্ষা আর রুচির প্রলেপ থাকা চাই। একবার গাঁয়ের কোনো এক আত্মীয় বাড়িতে গিয়ে একটি পরমাসুন্দরী মেয়ের দিকে তাকিয়ে ভবতোষ চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল তার নাকে নাকছাবি দেখে। এই মেয়েটির নাকে অবশ্য নাকছাবি নেই, কিন্তু সমস্ত মুখে স্থূল সারল্যের সঙ্গে অদ্ভুত একটু চতুর মনোভাবের ঢং মিশান রয়েছে। তা যেমন হাস্যকর তেমনি অশ্লীল, মেয়েটি যেন ইতিমধ্যেই জগৎরহস্যের পার দেখে ফেলেছে। পুরুষের স্বভাব, মেয়েদের সম্বন্ধে তার সমস্ত বাসনা কামনার স্বরূপ—কিছুই যেন ওর জানতে বাকি নেই।

ভবতোষ দু'হাত তুলে ছোট একটি সপ্রতিভ নমস্কার জানিয়ে বলল, 'বসুন। রমেন যে এমন লুকিয়ে বিয়ে ক'রে ফেলবে, তা আমি আশঙ্কাই

পূর্ণ হয়ে যায়। চোখের সামনে ভাসতে থাকে রমেনের ছোট ঘরখানা। রমেন, তার স্ত্রী, ভবতোষ আর তার অফুরন্ত কথার ঝরণা।
নিবারণবাবু এবং পরিবারের অন্য সকলেই বেশ কৃতজ্ঞ। রমেনের মুখে হাসি ফুটেছে; হাসি ফুটেছে মাধুরীর মুখে। আর এই অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তুলেছে ভবতোষ, যে রমেনের অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের মত নয়, যে স্ত্রীর বিদ্যা আর শ্রীহীনতার ইঙ্গিত দিয়ে রমেনকে ক্ষেপিয়ে তোলে না। ভবতোষ মনে মনে হাসে। সেও অবশ্য ক্ষেপিয়েই তোলে কিন্তু এ আরেক রকমের ক্ষেপামি। সুস্থতার সঙ্গে এই ক্ষেপামির রাসায়নিক মিশ্রণ না ঘটলে রঙ থাকে না পৃথিবীতে রস থাকে না।
রমেন আর মাধুরী সিনেমায় যাবে, সঙ্গী ভবতোষ। খেয়াল হলো জ্যোৎস্না রাত্রে নৌকো ক'রে ওরা গঙ্গায় বেড়াবে, ভবতোষ সঙ্গে আছে। ভবতোষ না হলে ওরা অসম্পূর্ণ। আর ওরা সামনে না থাকলে, সঙ্গে না থাকলে, ভবতোষের কথার উৎস অমন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে না।

সেদিন অফিস ছুটি। কিন্তু সাংসারিক কাজে ছুটি নেই। সমস্ত দিনটা মায়ের ফাইফরমাস খাটতে হলো। বোনদের আবদার মত কিছু জিনিস আনতে হোলো বাজার থেকে। ছোট ভাই এসে চেপে ধরল, তার অঙ্ক বুঝিয়ে দাও। সকলের দাবি মিটিয়ে ভবতোষ একটু বাইরে যাচ্ছে, মা ডেকে বললেন, 'এই রোদ্দুরে কোথায় যাচ্ছিস খোকা, এখনো তো তিনটে বাজেনি।'
ভবতোষ একটু রুক্ষভাবে বলল, 'কেন আরো কিছু দরকার আছে নাকি, বলে ফেলো।'
'না, আমার আর কিছু দরকার নেই। চা-টা খেয়েই না হয় বেরুতিস।'

'ও, সে চায়ের তো তোমাদের অনেক দেরি। আমার একটু কাজ আছে বাইরে।'

রান্নাঘরের সামনে দিয়েই পথ। সেটুকু অতিক্রম করতে না করতেই ছোট বোন নীলিমা এসে সামনে দাঁড়াল। হাতে চায়ের কাপ অল্প অল্প রুপালি ধোঁয়া উঠছে।

নীলিমা হেসে বলল, 'তোমার কাজ যে কোথায় তাতো জানি রাঙাদা, চা টা খেয়েই যাও, তাতে অন্য জায়গায় আর এক কাপ খাওয়ার নিশ্চয়ই বাধা হবে না।'

অসাময়িক এবং অপ্রত্যাশিত চায়ে তৃপ্ত হয়ে ভবতোষ বলল, 'খুব যে কথা শিখেছিস, কোথায় যাচ্ছি কি ক'রে জানলি ?'

'সেটা জানা এমন কিছু আশ্চর্য নয়, কিন্তু আশ্চর্য তোমার পছন্দ।'

ভবতোষ সকৌতুকে বলল, 'কেন পছন্দটা এমন মন্দ দেখলি কিসে ?'

নীলিমা মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'না মন্দ আর কি। তবু যদি রমেনদার বউকে স্বচক্ষে না দেখতাম।'

রমেনদার স্ত্রীর প্রসঙ্গে নীলিমার কাছে ভবতোষ নিজেই এমন অনেকবার মুখ বাঁকিয়েছে, কিন্তু আজ নীলিমার এই মুখ বাঁকানো—তীরের বাঁকা ফলার মত গিয়ে তার হৃদয়ে ঢুকল। অথচ কথাটি তো সত্যি। প্রশংসা করবার মত কিছুই নেই মাধুরীর মধ্যে। আর এই না থাকায় কিছুমাত্র ক্ষতিও নেই ভবতোষের। তবু একটা তীব্র বেদনায় মন যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

রমেন মাধুরীকে নিজের লেখা একটা গল্প পড়ে শোনাচ্ছিল, ভবতোষ এসে ঘরে ঢুকল।

'ইশ রসভঙ্গ করে ফেললাম নাকি ?'

মাধুরী একটু সরে বসে সলজ্জভাবে বলল, 'না-না, আসুন আসুন, আমি তো ভাবতেই পারিনি এই দুপুরে—'

ভবতোষ চেয়ার টেনে বসে বলল, 'আমার দুর্ভাগ্য, অথচ আমি যদি বলি এই দুপুর ভরে আমি কেবল এই কথাই ভাবছি তাহলে রমেন গল্প রেখে এখুনি লাঠি নিয়ে আসবে, সুতরাং সে কথা মনেই চাপা থাক। গল্পটা শেষ ক'রে ফেল রমেন।'

মাধুরী বাধা দিয়ে বলল, 'না না ও থাক। লেখা গল্পের চেয়ে মুখের গল্পই আমার ভালো লাগে, ভগবান যখন মুখ দিয়েছেন তখন কেন যে মানুষ গল্প না বলে লিখতে যায় আমি বুঝতে পারি না।'

ভবতোষ বলল, 'আমিও না। কিন্তু অমন ক'রে বলবেন না, রমেন আমাকে এখুনি ঘর থেকে বার করে দেবে।'

রমেন হেসে বলল, 'যাই বল ভবতোষ, ইদানীং তুমি যেন বড় ভীরু হয়ে পড়েছ, এত ভীরুতা যেন ভাল ঠেকছে না।'

ভবতোষ মাধুরীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই শুনুন।'

মাধুরী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'দুই বন্ধুতে বসেই শোনাশোনি করুন, আমি যাই কাজ আছে।'

ভবতোষ বলল, 'বাঃ, আমি আসবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার কাজের কথা মনে পড়ে গেল।'

মাধুরী বিব্রত হয়ে বলল, 'আচ্ছা বলুন আপনার কথা শুনেই যাই।'

ভবতোষ বলল, 'আমার প্রথম কথাই হলো এই, আমার কথা শুনেই যেতে পারবেন না।'

'তবে কি করতে হবে?'

'শুনে বসে থাকবেন এবং বসে শুনতে থাকবেন।'

মাধুরী বলল, 'বাঃ, আপনার আবদার তো কম নয়, আর আমার

কাজ ক'রে দেবে কে? বাজে কথা ছাড়ুন, কি বলবেন চট ক'রে বলে ফেলুন দেখি।'

মাধুরীর ভাবান্তরটা ভবতোষ লক্ষ্য না ক'রে পারল না। এই রূপহীনা অর্ধশিক্ষিতা মেয়েটি আত্মপ্রত্যয়ে হঠাৎ এমন দৃঢ় হয়ে উঠল কি ক'রে?

ভবতোষ বলল, 'একটি মেয়ে আপনার নিন্দা করছিল।'

'আমার? কেন?'

'কেন আবার? নিন্দার কি কোন কারণ থাকে? বলছিল আপনার নাকি রূপ নেই।'

একবার আরক্ত হয়ে মাধুরীর মুখখানা আরো ম্লান হয়ে উঠল, 'সে কথা তো সত্যিই।'

ভবতোষ বলল, 'না সত্যি নয়, রূপ ধরবার মত চোখ সকলের থাকে না। আর রূপটা বড় কথা নয়। আমরা পাঁচজনে মিলে তার একটা বাঁধা-ধরা সাধারণ মাপকাঠি তৈরি করেনি। আমরা যাকে বলি অসাধারণ তাও সেই কাঠির মাপেই মাপা। সেই মাপের একটু এদিক ওদিক হলে আর রূপ আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু সে আমাদের দৃষ্টিরই দুর্বলতা। রূপ দিয়ে কি হবে, আপনার স্বরূপ আছে, যা রূপের চেয়ে অনেক দামী।'

মাধুরীকে যেতে দেখে ভবতোষ বলল, 'ও কি, চলে যাচ্ছেন যে?'

মাধুরী চলে যেতে যেতে বলল, 'এই বুঝি আপনার কাজের কথা, ফের যদি আবার আপনি ও রকম পাগলামি শুরু করেন—'বলতে বলতে মাধুরী বেরিয়ে গেল।'

রমেনও একটু বিস্মিত হয়ে বলল, 'সত্যি ভবতোষ, হোলো কি তোমার, পাগল হয়ে গেলে নাকি তুমি?'

তার কণ্ঠে বিরক্তি চাপা রইল না।

মাধুরী একটু সরে বসে সলজ্জভাবে বলল, 'না-না, আসুন আসুন, আমি তো ভাবতেই পারিনি এই দুপুরে—'

ভবতোষ চেয়ার টেনে বসে বলল, 'আমার দুর্ভাগ্য, অথচ আমি যদি বলি এই দুপুর ভরে আমি কেবল এই কথাই ভাবছি তাহলে রমেন গল্প রেখে এখুনি লাঠি নিয়ে আসবে, সুতরাং সে কথা মনেই চাপা থাক। গল্পটা শেষ ক'রে ফেল রমেন।'

মাধুরী বাধা দিয়ে বলল, 'না না ও থাক। লেখা গল্পের চেয়ে মুখের গল্পই আমার ভালো লাগে, ভগবান যখন মুখ দিয়েছেন তখন কেন যে মানুষ গল্প না বলে লিখতে যায় আমি বুঝতে পারি না।'

ভবতোষ বলল, 'আমিও না। কিন্তু অমন ক'রে বলবেন না, রমেন আমাকে এখুনি ঘর থেকে বার করে দেবে।'

রমেন হেসে বলল, 'যাই বল ভবতোষ, ইদানীং তুমি যেন বড় ভীরু হয়ে পড়েছ, এত ভীরুতা যেন ভাল ঠেকছে না।'

ভবতোষ মাধুরীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই শুনুন।'

মাধুরী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'দুই বন্ধুতে বসেই শোনাশোনি করুন, আমি যাই কাজ আছে।'

ভবতোষ বলল, 'বাঃ, আমি আসবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার কাজের কথা মনে পড়ে গেল।'

মাধুরী বিব্রত হয়ে বলল, 'আচ্ছা বলুন আপনার কথা শুনেই যাই।'

ভবতোষ বলল, 'আমার প্রথম কথাই হলো এই, আমার কথা শুনেই যেতে পারবেন না।'

'তবে কি করতে হবে ?'

'শুনে বসে থাকবেন এবং বসে শুনতে থাকবেন।'

মাধুরী বলল, 'বাঃ, আপনার আবদার তো কম নয়, আর আমার

কাজ ক'রে দেবে কে? বাজে কথা ছাড়ুন, কি বলবেন চট ক'রে বলে ফেলুন দেখি।'

মাধুরীর ভাবান্তরটা ভবতোষ লক্ষ্য না ক'রে পারল না। এই রূপহীনা অর্ধশিক্ষিতা মেয়েটি আত্মপ্রত্যয়ে হঠাৎ এমন দৃঢ় হয়ে উঠল কি ক'রে?

ভবতোষ বলল, 'একটি মেয়ে আপনার নিন্দা করছিল।'

'আমার? কেন?'

'কেন আবার? নিন্দার কি কোন কারণ থাকে? বলছিল আপনার নাকি রূপ নেই।'

একবার আরক্ত হয়ে মাধুরীর মুখখানা আরো ম্লান হয়ে উঠল, 'সে কথা তো সত্যিই।'

ভবতোষ বলল, 'না সত্যি নয়, রূপ ধরবার মত চোখ সকলের থাকে না। আর রূপটা বড় কথা নয়। আমরা পাঁচজনে মিলে তার একটা বাঁধা-ধরা সাধারণ মাপকাঠি তৈরি করেনি। আমরা যাকে বলি অসাধারণ তাও সেই কাঠির মাপেই মাপা। সেই মাপের একটু এদিক ওদিক হলে আর রূপ আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু সে আমাদের দৃষ্টিরই দুর্বলতা। রূপ দিয়ে কি হবে, আপনার স্বরূপ আছে, যা রূপের চেয়ে অনেক দামী।'

মাধুরীকে যেতে দেখে ভবতোষ বলল, 'ও কি, চলে যাচ্ছেন যে?'

মাধুরী চলে যেতে যেতে বলল, 'এই বুঝি আপনার কাজের কথা, ফের যদি আবার আপনি ও রকম পাগলামি শুরু করেন—'বলতে বলতে মাধুরী বেরিয়ে গেল।'

রমেনও একটু বিস্মিত হয়ে বলল, 'সত্যি ভবতোষ, হোলো কি তোমার, পাগল হয়ে গেলে নাকি তুমি?'

তার কণ্ঠে বিরক্তি চাপা রইল না।

হঠাৎ ঘা খেয়ে ভবতোষ ম্লান হেসে উঠে দাঁড়াল, 'তোমার বউকে একটু ক্ষেপিয়ে দিচ্ছিলাম। কিন্তু তুমি যে ক্ষেপে যাবে—'

'না না, বসো বসো।'

কিন্তু ভবতোষ আর বসল না। না আর নয়, আর তাকে দিয়ে কোন প্রয়োজন নেই। এবার তার প্রস্থানের সময় হয়েছে।

তবু কি অদ্ভুত কথা। রূপ আর স্বরূপ। কিন্তু এর চেয়েও আরো ভালো কথা আরো চমৎকার ক'রে কেন বলতে পারল না ভবতোষ, যাতে মাধুরীর সমস্ত কুশ্রীতা সমস্ত মালিন্য, দেহমনের সকল দৈন্য ঢাকা পড়ে যায় ; যে কথার টুকরো হীরকখণ্ডের মত ওর সমস্ত অঙ্গ ভরে জ্বলতে থাকে।

ভবতোষ একবার থমকে দাঁড়াল। এসব কি ভাবছে সে ? না আর নয়। যথেষ্ট কৌতুক করা হয়েছে। এবার নিজেকে ওদের ভিতর থেকে সরিয়ে আনতে হবে, তার আর কোন প্রয়োজন নেই। বন্ধু রমেন ওই কুশ্রী কুরূপা বউকে ইতিমধ্যেই দুর্লভ মাথার মণি ক'রে তুলেছে, হারাই-হারাই ভাবে মন তার শঙ্কিত। এরই মধ্যে ওর ঈর্ষাকাতর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি চোখে ভাসতে শুরু করেছে। ভবতোষ নিজের মনেই হাসল। আর নয়, উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হয়েছে এবার ভবতোষ নিজেকে নেপথ্যে নিয়ে যাবে। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে তার।

ভবতোষ ওদের বাড়ির সীমানা পার হয়ে অন্য দিকে হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু কী অদ্ভুত ভ্যানিটি মেয়েদের, মাধুরীর মত মেয়েও কি ক'রে ভাবতে পারল এই উচ্ছ্বসিত স্তবস্তুতি তার জন্যেই, আর এ সব একেবারে অকৃত্রিম—একটুও ঠাট্টা নয়। আসলে ভবতোষ যদি কারো রূপে মুগ্ধ হয়ে থাকে সে তার আপন কথার মাধুরীর। কিন্তু সে কথা রমেনের বুঝবার সাধ্য নেই, তার স্ত্রীর তো নেই-ই।

ঘুরে ঘুরে কখন এসে ভবতোষ অন্তমনস্কের মত ওদের সদর দরজা দিয়ে ঢুকে ছাদের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে। ওরা কেউ দেখলে কি ভাববে। এই মুহূর্তেই ভবতোষের এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু সে দিনের মত আবার যদি সে এসে ছাদের আল্‌সে ধরে ঝুঁকে দাঁড়ায় আর ভবতোষকে দেখতে পেয়ে বলে, 'কি চা না খেয়েই পালিয়েছিলেন যে বড় ?'

'ভবতোষ বলবে, পালাবার কি আর জো আছে !'

মাধুরী হেসে জবাব দেবে, 'জো নেই, স্বীকার করছেন তাহলে ?'

হঠাৎ ভবতোষের সমস্ত শরীর শিউরে উঠল, এক দুর্বোধ্য আনন্দ আর দুঃসহ বেদনায় তার সমস্ত সত্তা যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। এ কি হোলো, তার অপরূপ কথার মাধুরী কেবল কি পৃথিবীর ওই একটিমাত্র কুরূপা মেয়ের দেহাধার ছাড়া কিছুতেই অন্য কোনো রূপ খুঁজে পেল না ?

রোগ

কিছুক্ষণ আগে একরকম জোর করেই কল্যাণী বিভূতিকে বসিয়ে গেছে নীলিমার রোগশয্যার পাশে। হেসে বলেছে, 'কি রকম ভাই তুমি, ভাড়া-করা নার্সরাও তো একটু নাওয়া খাওয়ার ছুটি পায়। আমরা কি তাও পাব না? কেবল ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে। এমন স্বার্থপর লোক যদি আর দুটি থাকে। আজ তো রবিবার, আজ তো আর অফিসটপিস নেই তোমার। আড্ডা? তা নয় একটা দিন বাদই দিলে? আজ সারাদিন তোমার ডিউটি রইল এখানে। মনে কর অফিসেই আছ। একটুও যদি ঘরে ঢুকি আমরা আজ।' তারপর বিভূতির চোখের দিকে চেয়ে অভয় দিয়ে গেছে, 'একটুক্ষণ কেবল বস, খেয়েই চলে আসব। ও তো ঘুমোচ্ছে। কিচ্ছু করতে হবে না তোমাকে, শুধু বসে বসে কেবল পাহারা দেওয়া।'

কিন্তু এই কয়েক মিনিটেই বিভূতির দম বন্ধ হবার জো হয়েছে। আর যা কিছু বল তাই সে করতে পারে, দৌড়োদৌড়ি ছুটোছুটি, ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা কিছুতেই সে পিছ্‌পা নয়; কিন্তু সেবাশুশ্রূষা তার দ্বারা হবে না। এই ভূতের মতন রোগীর ঘরে চুপচাপ বসে থাকা—নিজেকেই যেন রোগী বলে মনে হয় একেক সময়।

মাসখানেক ধরে প্রায় যমেমানুষে টানাটানি গেছে নীলিমাকে নিয়ে। জলের মত ব্যয় হয়েছে টাকা। এই বাজারেরও দামী ওষুধপত্র কিনতে

বিভূতি কার্পণ্য করেছে তা কেউ বলতে পারবে না। তবু শ্বশুরবাড়ির লোক খুশি হয়নি, নীলিমার মনে অসন্তোষ রয়ে গেছে। মেয়েদের মত কাজকর্ম বন্ধুবান্ধব ফেলে সে যদি দিনরাত বসে বসে সেবা করতে পারত তা হলেই কেবল হৃদয়ের পরিচয় দেওয়া হোতো যেন, তা হলেই সখ মিটত সকলের।

প্রথম কিছুদিন বিভূতির অদ্ভুত অপটুতায় কেউ কোনো কথা বলেনি। বরং একটু একটু উপভোগই করেছে। রোগ, রোগের চিকিৎসা কি নার্সিং সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানটুকু পর্যন্ত যেন নেই বিভূতির। শিশি থেকে ওষুধের গ্লাসে এক এক ডোজ ওষুধ ঢালতে পর্যন্ত সে পারে না— যা পাঁচ সাত বছরের ছেলেমানুষেও পারে। কথায় কথায় এমন সব মন্তব্য ক'রে বসেছে যে, ক্ষিতীশবাবু, মন্দাকিনী বা কল্যাণী কেউ না হেসে থাকতে পারেননি। সে সব কথা শুনে কে বলবে বিভূতি একজন উচ্চ শিক্ষিত পূর্ণবয়স্ক যুবক—আকৈশোর যার ক'লকাতায় কেটেছে। গাঁয়ের কোনো নিরক্ষর চাষীও এর চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখে। বিভূতি কি চোখকান বুজে চলে, এতখানি বয়স পর্যন্ত সে কি কারো অসুখবিসুখ হতে দেখেনি, ওষুধপত্রের নাম শোনেনি, কোনো ডাক্তার কবিরাজের সঙ্গে আলাপ করেনি কোনোদিন?

কিন্তু নীলিমার রোগভোগের দিন যত বেড়েছে, রাত জাগার পালা যত বেশি পড়েছে, ততই বিভূতির অদ্ভুত অপটুতা থেকে সকলের সস্নেহ প্রশ্রয় এবং কৌতুক উপভোগের মাত্রা কমতে কমতে শেষে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। প্রত্যেকেই বিরক্ত হয়েছে। সব কিছুরই একটা সীমা আছে। নাওয়া নেই খাওয়া নেই, বুড়ো মানুষ হয়ে রাতের পর রাত জাগছেন ক্ষিতীশবাবু—সারাদিনের অফিসের খাটুনির পর। এক মুহূর্ত বিশ্রাম

নেই মন্দাকিনী আর কল্যাণীর, আর স্বাস্থ্যবান জোয়ান পুরুষ হয়ে বিভূতি পাশের ঘরে নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে, ছুটির দিনে বন্ধুমহলে আড্ডা দিয়ে ফিরছে রাত বারোটায়—এদিকে নিজের স্ত্রী বসেছে মরতে। মায়া দয়া, কর্তব্যবোধ না থাক, একটু চক্ষুলজ্জাও তো থাকে মানুষের।

এসব সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা বিভূতির যে কানে না গেছে তা নয়। কানে যাতে যায় সেই জন্যেই এসব আলোচনা হয়েছে, বিভূতি পাশের ঘরে আছে তা জেনেও।

'সত্যি কলিদি, ভারি কষ্ট হচ্ছে আপনাদের। আমি তখনই তো বলেছিলাম হাসপাতালে দিয়ে আসি, কিংবা রেখে আসি আমার মার কাছে, নিজের বাসায়। সেখানে শুশ্রূষার কোনো অসুবিধা হবে না। মা'র কিছুতে ক্লান্তি নেই। আমার মা এমন পাঁচ সাতটা রোগীর শুশ্রূষা করতে পারেন একা। আর কারো দরকার হয় না তাঁর।'

কল্যাণীর মুখ শক্ত এবং কালো হয়ে উঠেছে, তারপর তীক্ষ্ণ একটু হেসে বলেছে সে, 'তাই তো এমন মার এমন ছেলে। কিন্তু যে রকম রোগী, তোমার বাড়িতে নিয়ে যেতে শুশ্রূষার আর দরকার হোতো না, একেবারে কেওড়াতলায় নিয়ে হাজির করতে হোতো।'

'তা হোতোই বা, কষ্ট তো আপনাদের এমন ক'রে পেতে হোতো না রাত জেগে জেগে। আচ্ছা, কাল থেকে একটা নার্স ঠিক ক'রে দি কেমন?'

কোনো জবাব না দিয়ে কল্যাণী নিজের কাজে মন দিয়েছে। শিক্ষিত হলেই মানুষের হৃদয় উদার হয় না। এত অকৃতজ্ঞ, এত অভদ্র আর ছোট অন্তঃকরণ বিভূতির। দু'দিনের মধ্যে তার সঙ্গে কথা বলতেই প্রবৃত্তি হয়নি কল্যাণীর।

খানিক বসে থেকে অতি সন্তর্পণে বিভূতি উঠতে যাচ্ছে নীলিমা ধীরে ধীরে চোখ মেলল।

'পালাচ্ছ বুঝি ?'

ক'দিন ধরে একটু একটু কথা বলতে পারে নীলিমা।

বিভূতি বলল, 'পালাচ্ছি মানে ? ও ঘর থেকে আসছিলাম একটু।'

'নীলিমা একটু চুপ ক'রে যেন দম নিল। তারপর আবার আস্তে আস্তে বলল, 'আচ্ছা যাও। ভারি কষ্ট হয় তোমার, ভারি ঘেন্না করে এখানে আসতে না ?'

নিষ্করুণ কঠিন কণ্ঠে বিভূতি জবাব দিল, 'ঠিক ধরেছ।' বিভূতি আবার উঠে দাঁড়াল। এবার নীলিমা তার দুর্ব্বল ক্ষীণ হাতখানি দিয়ে বিভূতির পায়ের পাতা স্পর্শ করল, 'একটু বসো শুধু আর একটুখানি।'

নীলিমার দিকে তাকাল বিভূতি। কী করুণ আর ক্লান্ত দুটি চোখ নীলিমার। ভারি মায়া হয় দেখলে। মনেই পড়ে না, এই একটু আগেও দুর্বল কণ্ঠে কী কঠিন কথা তাকে বলেছে নীলিমা। ওর বিছানার পাশে ঘেঁষে আবার বসে পড়ল বিভূতি। দু'একগাছ রুক্ষ চুল ওর কপালের ওপর উড়ছে। বিভূতি হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে গেল। নীলিমা তার শীর্ণ দুর্বল হাত রাখল বিভূতির হাতের ওপর, বলল, 'আর চলে যেও না।'

এই নির্ভরতা, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ—ভারি চমৎকার লাগল বিভূতির। এমন মিষ্টি কাতর মিনতি নীলিমার কণ্ঠে যেন আর কোনোদিন শোনা যায় নি। বিভূতি ওর সর্বাঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। দীর্ঘ ঋজু দেহ আরো শীর্ণ রয়েছে রোগে। ফ্যাকাশে হয়েছে রঙ, রক্তের চিহ্নমাত্র নেই এতটুকু। তবু এই রোগশীর্ণ দেহ কেমন যেন ভারি সুন্দর লাগল বিভূতির চোখে। কেমন অসহায়ভাবে বিছানার সঙ্গে একেবারে যেন

মিশে রয়েছে নীলিমা। কিন্তু এক রুগ্নতা এক অপূর্ব করুণ সৌন্দর্য এনে দিয়েছে যা কোনোদিন চোখে পড়েনি বিভূতির। এক মুহূর্ত বিভূতি অপলকে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। সুন্দরী নারীর দেহে যে কোনো কিছুই অলংকার হয়ে উঠে; কিন্তু রোগও যে এমন অপরূপ সুষমা এনে দিতে পারে তা তো বিভূতির জানা ছিল না। রোগকে তাহলে যতটা কুৎসিত সে ভেবেছিল তা কি সে নয়?

বিভূতির অপলক মুগ্ধ দৃষ্টির দিকে হঠাৎ চোখ পড়ল নীলিমার। কী বুঝল, সেই জানে। একটু বুঝি রক্তের আভাস দেখা দিল তার শীর্ণ কপালে, একটু বুঝি হাসি এসে গেল তার পাতলা শুকনো ঠোঁট দু'টির মাঝখানে। গভীর আত্ম-তৃপ্তিতে নীলিমা বলল, 'আমি যদি মরে যেতাম কী করতে?'

বিভূতি বলল, 'মরে যাবে কেন?'

নীলিমার পাতলা ঠোঁটে আবার একটু হাসি ফুটে উঠল, 'তুমি আর চলে যাবে না বলো, সব সময়েই থাকবে এখানে।'

বিভূতি তার সরু লম্বা আঙুলগুলি আলগোছে রাখল ওর ঠোঁটের ওপর। যেন ওই ক্ষীণ পাতলা হাসিটুকু আঙুল দিয়ে সে ছুঁয়ে দেখতে চায়। সস্নেহে বলল, 'সব সময়েই তো এখানে আছি নীলি।'

নীলিমা নিশ্চিন্তে একবার চোখ বুজল। নিজের শক্তি সম্বন্ধে এতক্ষণে সে সচেতন হয়ে উঠেছে। আর সাধ্য নাই বিভূতির তাকে ঘৃণা করবার তার রোগকে ঘৃণা করবার, তার কাছে না এসে থাকবার। ওর চোখের মুগ্ধতা নীলিমাকে আশ্বাস দিয়েছে, পথ দেখিয়েছে।

পরদিন অফিসের পর বিকাল বেলায় বিভূতিকে আর ডেকে বসাতে হোলো না, নিজেই এসে সে বসল। 'কেমন আছ এখন নীলি?'

নীলিমা পরম নির্ভরতার সঙ্গে তার হাতখানা বিভূতির কোলের ওপর

তুলে দিল, 'এখন? এখন খুব ভালো লাগছে।'

বিভূতির দিকে চেয়ে নীলিমা একটু হাসল। অদ্ভুত লাগে ওর এই রুগ্ন-দুর্বল হাসি।

নীলিমা বলল, 'ভারি স্বার্থপর আমি, না? সব সব সময় তোমাকে কাছে আটকে রাখতে চাই। ভালো লাগে না যে একটুও তোমাকে ছাড়া। আর কেউ কাছে এলে রাগ হয়ে যায় আমার। ওরা ভাবে রোগে ভুগে ভুগে আমার মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেছে। সত্যিই কি খিটখিটে হয়ে গেছি আমি খুব?'

যে কথাগুলিকে অন্য সময় ন্যাকামি মনে হতে পারত বিভূতির, এখন এই রোগশয্যায় নীলিমার অসহায় দুর্বলকণ্ঠে তা অত্যন্ত মধুর লাগে। নীলিমার আঙুলগুলি নিয়ে বিভূতি নাড়াচাড়া করতে থাকে; ভালো লাগে ওর রুক্ষ চুলগুলির ওপর হাত বুলাতে, ছোট সাদা কবুতরের মত কী কোমল পেলব আর অসহায় এই নীলিমা। অতি সন্তর্পণে ওকে বুকে তুলে নিতে ইচ্ছা করে বিভূতির। কিন্তু সাবানের ফেনার মত নরম আর ক্ষণস্থায়ী ও। ওকে ধরলেই যে মিলিয়ে যাবে!

নীলিমা বলে, 'তুমি শুধু আমার কাছে বসে থাকো। আর কিছু চাই না, কাউকে চাই না আমার। কোনো ওষুধবিষুধ লাগবে না, শুধু তুমি আমার কাছে কাছে থাকো, তাতেই আমি ভালো হয়ে উঠব।'

বিভূতি ওর হাতটা নিজের মুঠির ভিতর নিয়ে আস্তে আলগোছে একটু চাপ দেয়, 'আমি তো তোমার কাছেই আছি নীলি।'

বেল ফুলের একটা চারা আছে টবে উঠানের একধারে। দু'তিনটে ফুল ফুটেছে তাতে। কল্যাণীকে দিয়ে ফুল দুটো তুলে আনলে নীলিমা। বিভূতি আসতে তার হাতে দিয়ে বলল, 'নাও।'

প্রথম প্রেমের দিনগুলি যেন ফিরে এসেছে নতুন ক'রে। সেই একটু ছোঁয়া, একটু কথা, একটু হাসি। আর এই টুকরোগুলি জড় ক'রে মনে মনে তা দিয়ে মালা গাঁথা।

কী হয়েছে বিভূতির। নতুন এক নেশায় যেন পেয়ে বসেছে তাকে। অফিসে কোনোরকমে ঘণ্টা সাতেক কাটিয়ে আজকাল সে একেবারে সোজা চলে আসে নীলিমার কাছে। আড্ডা নেই, বন্ধুবান্ধব নেই, সমস্ত পৃথিবী যেন ধরা দিয়েছে নীলিমার ঘরটুকুর মধ্যে। পরিসর তার কম, কিন্তু কী ঘন আর কী গভীর। আর প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন রঙ বে-রঙের ফুল কিনে নিয়ে আসে বিভূতি। রুক্ষ এলোচুলের মধ্যে গুঁজে দেয়, কয়েকটা বালিশের পাশে আর বিছানা ভরে ছিটিয়ে রাখে।

মন্দাকিনী বড় মেয়েকে আড়ালে ডেকে বললেন, 'ও কি হচ্ছে যত সব সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড। অসুখের বিছানায় ফুল ছড়িয়ে রাখতে কেউ কোনো দিন দেখেছ কখনও? নিষেধ করে দিস তো বিভূতিকে।' কল্যাণী ম্লান হাসে, 'আমি নিষেধ করবার কে মা? আমার নিষেধ অন্যে শুনবেই বা কেন?'

কিন্তু এক ফাঁকে কল্যাণী ঘরে ঢোকে ওদের। বলে, 'ইশ, ফুলের গন্ধে ঘর একেবারে ভরে উঠেছে যে! এ কি রোগশয্যা না ফুলশয্যা নীলি?'

নীলি বলে, 'ফুলশয্যার দিনে আমার জ্বর হয়েছিল মনে আছে দিদি? আজ রোগশয্যায় তার প্রতিশোধ নিচ্ছি।'

ভারি সুন্দর লাগলো নীলিমার কথা বিভূতির। এত চমৎকার ক'রে সে বলতে পারে। আর এমন একান্ত ক'রে সম্পূর্ণ ক'রে নীলিমাকে যেন কোনোদিন পাওয়া যায়নি। নীলিমা সম্পূর্ণ তার। ভাবতেও কী আনন্দ লাগে, কী চমৎকার এর অনুভূতি। মৃদু গুঞ্জরণে সময় কাটে। কত কথা আর কত গল্প। নীলিমা বলে, 'মরে গেলে তো ভারি ঠকে যেতাম, তোমাকে এমন কাছে পেতাম কেমন ক'রে?'

হঠাৎ নীলিমার চোখ দু'টি সজল হয়ে ওঠে, ভারি হয়ে আসে গলা। বিভূতি ছেলেমানুষের মত বলে, 'মরে গেলেই হোলো আর কি?'

নীলিমা বলে, 'কিন্তু এই অসুখে অনেক টাকা পয়সা তোমার নষ্ট হয়ে গেল তো।'

বিভূতি যেন লজ্জিত বোধ করে টাকাপয়সার কথায়, 'তা যাক, তোমাকে তো ফিরে পেলাম।'

শান্ত গম্ভীর চোখ মেলে নীলিমা স্বামীর দিকে তাকায়। নির্ভর প্রসন্নতায় অদ্ভুত সুন্দর দুটি চোখ। এত মূল্য নীলিমার স্বামীর কাছে, এত মূল্য তার মত নিতান্ত সাধারণ একটি মেয়ের।

একান্ত ক'রে নীলিমার এই আত্মসমর্পণ অতি অপূর্ব মনে হয় বিভূতির। কিন্তু সেরে উঠতে বেশ সময় লাগে নীলিমার। অমাবস্যার পূর্ণিমায় অন্ত উপসর্গের সঙ্গে জ্বরও বাড়ে। আবার ডাক্তার আসে, আসে ওষুধপত্র। কিন্তু কল্যাণীদের আর তেমন সম্পূর্ণ অংশ গ্রহণ করতে হয় না। সেবা-পরিচর্যা ইতিমধ্যেই কিছু কিছু শিখে ফেলেছে বিভূতি। নীলিমার শুশ্রূষায় বিভূতি যেন নতুন এক আনন্দের আস্বাদ পেয়েছে। যে সব কাজকে আগে সে ভয় করত, ঘৃণা করত, তাতে এখন তার তৃপ্তির অন্ত নেই।

আরো এক নতুন খেয়াল দেখা দিয়েছে বিভূতির। ওষুধপত্র তো আনেই সঙ্গে সঙ্গে কোন এক ডাক্তার বন্ধুর কাছ থেকে মোটামোটা ডাক্তারী বইগুলিও সে বয়ে নিয়ে আসে, আর নীলিমার শিয়রে বসে রাত জেগে ম্লান আলোয় ওই সব নীরস বিজ্ঞানের বই সে পড়তে আরম্ভ করে। জটিল স্ত্রীরোগে ভুগছে নীলিমা। ডাক্তারের কথায় সব বোঝা যায় না, ডাক্তার কোনোদিন সব কিছু খুলে বলেও না রোগীর আত্মীয়স্বজনকে। নিজেকেই কষ্ট ক'রে জানতে হবে বিভূতির কোথায় এসবের উৎপত্তি, কিসেই বা এর

নিরাময়। সব বোঝা যায় না। মাঝে মাঝে ভারি কঠিন লাগে, তবু অসীম ধৈর্য্য বিভূতির, অপরিসীম অধ্যবসায়। নীলিমার জন্য সমস্ত চিকিৎসাশাস্ত্রকেই সে যেন ভালোবেসে ফেলেছে। নতুন এক জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করেছে সে। এমন যে নীরব বিজ্ঞান তাও নীলিমার সাহচর্যে অপূর্ব রসময় হয়ে উঠেছে তার কাছে। আজ যা রাত জেগে পড়ে, কাল তা নীলিমাকে সে সরস ভাষায় বুঝিয়ে দেয়; বেশ লাগে বিভূতির।

চিকিৎসক হিসাবে বেশ খ্যাতি আছে বীরেনবাবুর, অভিজ্ঞতাও দীর্ঘ দিনের। সময় লাগলেও নীলিমা দিনের পর দিন ভালোই হয়ে উঠেছে তাঁর চিকিৎসায়, তবু এই দিনগুলির কি আর শেষ হবে না, যেন যুগের পর যুগ কেটে যাচ্ছে। কতদিনে নীলিমা উঠে দাঁড়াতে পারবে? সবাইকে নীলিমা জিজ্ঞাসা করে। স্বামীকে বলে, 'কত কষ্টই যে তোমাকে দিচ্ছি মাসের পর মাস।'

'কষ্ট! আমার তো একটুও কষ্ট হয় না নীলিমা।'

বিভূতির কণ্ঠে প্রসন্নতার আভাস পেয়ে নীলিমা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থাকে।

পর পর গোটা দুই জো' বাদ যায়। তারপর থেকে বেশ দ্রুতবেগেই সুস্থ হয়ে ওঠে নীলিমা। বীরেনবাবু বিস্মিত হন। এত প্রাণশক্তি ওর মধ্যে! এত দীর্ঘ রোগ ভোগের পর এত তাড়াতাড়ি স্বাস্থ্যলাভ করতে তো কাউকে দেখা যায় না। আজকাল একটু একটু উঠে বসতে পারে নীলিমা। বসে বসেই হাত বাড়িয়ে ওষুধের শিশি আর অন্য সব জিনিসগুলি নিজের পছন্দমত গুছিয়ে রাখতে চেষ্টা করে।

বিভূতি বলে, 'ওসব দুদিন বাদেই না হয় কোরো নীলিমা, আগে ভালো হয়ে ওঠো।'

নীলিমা অস্বাভাবিক জোর দিয়ে বলে, 'ভালো তো আমি হয়েই গেছি।' চিকিৎসকও তাতে সায় দেন। ওকে স্বাধীন স্বচ্ছন্দভাবে চলতে দেওয়াই এখন ভালো। মনের জোরই আসল জোর।

দেখতে দেখতে যেন নতুন শরীর গ্রহণ করে নীলিমা। শরীরকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায় তার মনের উৎসাহ। নারকেল গাছ দুটোর ফাঁকে হলুদ রঙের চাঁদ ওঠে গোল হয়ে। কি সুন্দর, কি চমৎকার নতুন সবুজ পৃথিবী তার চোখের সামনে। দু'একজন আত্মীয়-বন্ধু আসে অভিনন্দন জানাতে। হাতে টুকিটাকি উপহারের জিনিস। উল্লাসে উচ্ছ্বাসে বালিকার মত চপল হয়ে ওঠে নীলিমা। যেন মানুষ এই প্রথম দেখল জীবনে।

'অরুণদা, চল না সিনেমায় নিয়ে যাবে আজ আমাকে সন্ধ্যার শো'তে।'

অরুণ হাসে, 'আজ নয় নীলি, আরো যাক দু'চার দিন।'

নীলিমা যেন আটদশ বছরের মেয়েতে পরিণত হয়েছ। 'কেন যাবে আরো দু'চার দিন? আজই, আজই চল। বিশ্বাস কর, আমি সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেছি। ভাল হইনি?'

'নিশ্চয়ই, সুন্দরও হয়েছ।'

নীলিমা খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে, 'তোমার অসভ্যতা আর গেল না অরুণদা।'

আর পাশের ঘরে বসে তার এই হাসি আর উল্লাস অত্যন্ত কুশ্রী মনে হয় বিভূতির কাছে। কী তরল, কী ছেলেমানুষ হয়ে গেছে নীলিমা। কোথায় গেল অতল রহস্যময় কালো চোখের সেই করুণ প্রশান্ত দৃষ্টি? কোথায় সেই অনুভূতিঘন গভীরতা? সে মরে গেছে, সে নীলিমা আর নেই।

ট্রাঙ্ক থেকে দামী বিচিত্র-রঙের শাড়ি বার করল নীলিমা, প্রসাধন করল অনেকক্ষণ ধরে আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। নিজের প্রতিবিম্বের দিকে সে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। বেশ লাগে নিজেকে দেখতে। খানিক পরে ঘুরে গেল বিভূতির ঘরে। বিভূতি ঘাড় গুঁজে সেই মোটা ডাক্তারী বইটা পড়ছে। নীলিমা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল বইটাকে। 'ওকি হচ্ছে বসে বসে, ওই অলুক্ষুণে হতচ্ছাড়া বইটা এখনো রেখেছ বাড়িতে? বিদায় ক'রে দাও, বিদায় ক'রে দাও ওকে। চলো যাই, একটা রিটার্ন ভিজিট দিয়ে আসা যাক মীনাদের বাড়ি থেকে। সেখান থেকে একেবারে সিনেমাতে। টিকিট কেটে অরুণদা অপেক্ষা করবে আমাদের জন্যে।'

খুশিতে টলটল করছে নীলিমার চোখমুখ, সর্বাঙ্গ। কিন্তু বিভূতির মনে হোলো তা বড় তরল, বড় হাল্কা। শোভন সংযত।প্রকাশের অভাবে তাকে রীতিমত অশ্লীল বলে মনে হয়।

নীলিমা হাত ধরে টেনে তুলল বিভূতিকে। শরীরে তার কতখানি নতুন শক্তির সঞ্চার হয়েছে তার পরিচয় দিচ্ছে যেন সে। 'ওঠ ওঠ, শিগগির জামাকাপড়টা পাল্টে নাও। ওই দেখ, বসে বসে ওকি করছ? ওই সব রাবিশ শিশি বোতলের স্তূপ তাক ভরে সাজিয়ে রেখেছ যে অত যত্ন ক'রে, ডিসপেনসারি খুলবে নাকি? না ভেবেছ, ওগুলি বাড়ি পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে? আচ্ছা কাণ্ড তোমার। বাবারে বাবা, দিনের পর দিন কতখানি ক'রে বিষই যে গিলতে হয়েছে ঢকঢক ক'রে। ফেলে দাও ফেলে দাও ওসব। কী হবে ছাই আর ও গুলি দিয়ে। নাও তৈরি হয়ে নাও তাড়াতাড়ি, আর দেরি কোরো না লক্ষ্মীটি।'

দুঃসহ বিরক্তিতে মন ভরে ওঠে বিভূতির। যে রোগকে সে ঘৃণা করত তার আর চিহ্ন নেই নীলিমার শরীরে। ওর শীর্ণ গালে রক্তের

সঞ্চার হয়েছে। নতুন স্বাস্থ্যের আবির্ভাব হয়েছে ওর দেহে। তবু ওর দিকে চেয়ে চেয়ে কেন যেন ঘৃণায় রি রি করতে থাকে বিভূতির সর্বাঙ্গ। মন ভরে যায় অদ্ভুত বিতৃষ্ণায়। কঠিন শুষ্ককণ্ঠে বলে, 'কি ছেলেমানুষী আরম্ভ করেছ নীলিমা, যাও এখান থেকে, তোমার যা খুশি কর গিয়ে।' মেঝে থেকে বইটা আবার তুলে নিল বিভূতি।

নিজের আনন্দের রঙে নীলিমার সমস্ত পৃথিবী এতক্ষণ রঙীন হয়েছিল। ভেসে চলেছিল খুশির স্রোতে। এবার হঠাৎ ঘা খেয়ে নীলিমা স্বামীর দিকে চোখ তুলে তাকাল। এই কি বিভূতির চোখ? আনন্দ নেই, উল্লাস নেই, বিভূতির চোখ কি পাথরে গড়া? ঘৃণায় আর বিরক্তিতে তা যেন বিকৃত আর ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। এতক্ষণে মনে পড়ল সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের পর বিভূতি তাকে আর কোনো উপহার এনে দেয়নি। এই ক'দিনের মধ্যে কোনো উৎসাহ জাগায়নি, অভিনন্দন জানায়নি। বিভূতি কি চায় না তাহলে নীলিমা নীরোগ হয়ে উঠুক, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করুক। আত্মীয়, পাড়াপ্রতিবেশী পর্যন্ত আশীর্বাদ ক'রে গেছে, আনন্দ জানিয়ে গেছে নীলিমা ভালো হয়ে উঠেছে বলে; আর বিভূতি তার স্বামী হয়ে, পৃথিবীতে তার পরম শুভাকাঙ্খী সবচেয়ে ভালবাসার পাত্র হয়ে এতে খুশি হতে পারল না? নীলিমার আরোগ্য চায় না, স্বাস্থ্য চায় না, সৌন্দর্য চায় না, তবে কী চায় বিভূতি, কী চায়? নীলিমা কয়েক পা এগিয়ে এলো বিভূতির কাছে, একখানা হাত রাখল বিভূতির কাঁধে, 'এই শোন।'

বিভূতি ঘাড় ফেরাল, বিরক্তিতে কপাল তার কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে। 'আবার? আবার এসেছ তুমি ইয়ারকি দিতে? কিন্তু আমি তো আর তোমার মত নবজন্ম লাভ করিনি যে উড়ে উড়ে বেড়াব প্রজাপতি সেজে? চিকিৎসা বাবদ অনেক দেনা হয়েছে বাজারে, সেগুলো শোধ

দেওয়ার ভাবনা আমাকেই ভাবতে হবে। বলেছি তো, তুমি যাও না, বেড়িয়ে এসোগে যেখান থেকে খুশি।'

নীলিমার মুখে অদ্ভুত হিংস্র একটুকরো হাসি। একঝলক তরল বিষ যেন লেগে রয়েছে তার ঠোঁটে, 'পাগল হয়েছ! তুমিও যেমন। কোথায় আবার যাব বেড়াতে। তার চেয়ে ওদের কাউকে বল বিছানাটা পেতে দিক, আবার শুয়ে পড়ি। তাক থেকে ওষুধের শিশিগুলি নামিয়ে আনো, আর তুমি এসে বস শিয়রের কাছে আগের মত ওই ডাক্তারি বইটা নিয়ে। রোগশয্যাই যে আমাদের ফুলশয্যা। এ ছেড়ে যাবো আবার কোথায়। এই দিব্যি ক'রে বলছি তোমাকে, আমি আর কোনদিন উঠতে চাইব না।'

মহাশ্বেতা

সন্ত চুণকাম করা দেয়ালগুলি শুধু শুভ্রই নয়, শূন্যও। একখানা ফটোগ্রাফ কিংবা ক্যালেণ্ডার পর্যন্ত নেই। একপাশে একখানি তক্তপোশে বিছানা পাতা। সাদা চাদরটা মেঝে পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। পাশেই ছোট একটি টেবিল দু'একখানা বইপত্র আর একটি ফুলদানিতে কয়েকটি চন্দ্রমল্লিকা। তক্তপোশের উপর পা ঝুলিয়ে-বসা অমিতার দিকে আর একবার তাকাল চিন্মোহন। ঘরের মতই নিরাভরণ শুভ্র ওর সজ্জা। ভিজে এলোচুল সমস্ত পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে, ও যেন কালো প্লেটের ওপর খড়ি দিয়ে লেখা একটি শ্লোকের স্তবক।

ইচ্ছা করলে এখান থেকেই হাত বাড়িয়ে ওর একখানা হাত চিন্মোহন তুলে নিতে পারে। অমিতা একটুও বাধা দেবে না, একটুও বিস্মিত হবে না। তবু থাক, এই স্তব্ধ গম্ভীর মর্মরমূর্তির সামনে বসে প্রশান্ত মাধুর্যে মন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, কোনো ক্ষোভ থাকে না, কোনো চাঞ্চল্য জাগে না। রূপের এই অনুভূতি চিন্মোহনের জীবনে এই নতুন। এতকাল উজ্জ্বল শিখায় নিজেকে আহুতি দিয়ে ছিল আনন্দ। দহনজ্বালায় নিজের অস্তিত্বকে তীব্রভাবে অনুভব করা যেত। কিন্তু অমিতার সঙ্গে পরিচয় না হলে জীবনে মধুর প্রশান্তির এই আস্বাদন আর হয় তো ঘটে উঠত না।

কোনো কোনো দিন চুলের মত সূক্ষ্ম একটু কালো পাড় থাকে কাপড়ে আজ

একেবারে সাদা থান পরেছে অমিতা। তাতে গাম্ভীর্য যেন আরো গাঢ় হয়ে উঠেছে। রিক্ততার মধ্যেই যেন ওর ঐশ্বর্যের পূর্ণ প্রকাশ। একটু চুপ ক'রে থেকে চিন্মোহন ডাকল, 'শ্বেতা।' বেশ আর পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে ওর নাম দিয়েছে চিন্মোহন মহাশ্বেতা। স্নিগ্ধ হাসল অমিতা। চিন্মোহনের মনে হোলো ওর হাসির রঙও যেন সাদা একগুচ্ছ যুঁই ফুলের মত। যেমন স্বল্প, তেমনি সুন্দর।

'তবু ভালো, আজ আর মহাশ্বেতা নই।'

চিন্মোহন বলল, 'মহাশ্বেতাই তো। আমার দেওয়া নাম যাতে সম্পূর্ণ সার্থক হয় তার জন্যে শাড়ির প্রান্ত থেকে কালো রেখাটুকু পর্যন্ত তুলে দিয়েছ।'

অমিতা কোনো কথা বলল না।

চিন্মোহন বলল, 'বেশ আমার কোনো আপত্তি নেই, এ বেশ যেদিন নিজে থেকে বদলাবে আমি সে দিনের প্রতীক্ষা ক'রে থাকব। কিন্তু বদলাতে একদিন হবেই।'

চিন্মোহন তার চোখের দিকে তাকাতে অমিতা চোখ নামিয়ে নিল। কি যেন আছে চিন্মোহনের দৃষ্টিতে, যাতে সমস্ত অন্তর থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে।

বেশ বদলান আর রোধ করা যাবে না একথা অমিতাও জেনেছে। সে সম্ভাবনা দিনের পর দিন, মুহূর্তের পর মুহূর্তে ক্রমেই নিকটতর হয়ে আসছে। বদলাতে হবে। শুধু কি বেশ? জীবনের মূল ধারাই ছুটবে নতুন গতিতে। কিন্তু কেমন হবে সে পথ? কেমন হবে পরিবর্তন। এখনো শঙ্কায় মন দুলতে থাকে, সংশয় সম্পূর্ণ ঘুচতে চায় না। এই পাঁচ বছরের বৈধব্য জীবনের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে গেছে। এ ছাড়া অন্য জীবনের কথা কল্পনাও যেন করা যায় না। কিন্তু যার স্মৃতির জন্যে এই

কৃতজ্ঞতা, সেই মৃত অমূল্যের ওপর মন কি অমিতার আজো তেমনি একনিষ্ঠ আছে? দৈনন্দিন জীবনে বিধবার আচার নিষ্ঠা সে তেমনি মেনে চলেছে, কিন্তু নিজের মনের খবর তো অমিতা জানে। এই শুভ্র বেশবাসের সঙ্গে মনের মিল কই? কত রাত্রে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলেছে অমিতা, তবু অমূল্যের মুখ স্পষ্ট ক'রে মনে পড়েনি; সেখানে ভেসে উঠেছে চিন্মোহনের প্রতিমূর্তি। অমিতা আর পারে না, এই অন্তর্দ্বন্দ্ব আর আত্মনিরোধের অন্ত কবে হবে? গোপন কাঁটায় মুহুর্মুহু ক্ষতবিক্ষত হওয়ার শক্তি আর অমিতার নেই। এবার সে শিথিল দেহে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেবে। দুর্বার স্রোত যেখানে খুশি তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাক।

তবু ওর চোখের সামনে নিজের মনকে এমন ক'রে উন্মুক্ত ক'রে মেলে ধরবার কি প্রয়োজন ছিল? এর চেয়ে আজীবন প্রচ্ছন্ন থাকতে পারলে নিজেকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাখতে পারলে যেন কৃতিত্ব ছিল, আনন্দ ছিল বেশি। দিনের পর দিন পাপড়ির পর পাপড়ি খুলতে থাকবে, তবু তার মনের কিছুতে নাগাল পাবে না চিন্মোহন; অমিতা তেমনি ভেবে রেখে ছিল। কিন্তু তা হোলো কই। কখন কোন অজ্ঞাত মুহূর্তে একসঙ্গে সমস্ত দলগুলি খুলে গেল, অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ওর চোখের আলোয় কিছুই আর গোপন রইল না।

পর্দার বাইরে থেকে ভুবনবাবু ডাকলেন, 'অমি, মা।'

অমিতা হঠাৎ কোনো কথা বলতে পারল না।

চিন্মোহন বলল, 'আসুন।'

ভুবনবাবু ঘরে ঢুকতেই চিন্মোহন চেয়ার ছেড়ে দিয়ে তক্তপোশের এক পাশ ঘেঁষে বসে পড়ল। আর সেই মুহূর্তে সংকোচের সঙ্গে অমিতা আরো খানিকটা সরে বসল। মেয়ের দিকে তাকিয়ে ভুবনবাবু মনে

মনে হাসলেন। ওর বৈধব্যক্লিষ্ট শীর্ণ চেহারায় যেন এক নতুন রঙের ছোপ লেগেছে। বয়স ওর পঁচিশ হতে চলল, গত বছর বি, টি, পাশ করে গুরুগম্ভীর হেড মিষ্ট্রেস হয়েছে। বাড়িতেও খাওয়া শোওয়া নিয়ে ওর কড়া শাসনে ভুবনবাবুকে সর্বদা তটস্থ থাকতে হয়! সেই মেয়ের এই বালিকাসুলভ লজ্জা তাঁর চোখে ভারি অপরূপ লাগল। ভুবনবাবু মুহূর্তের জন্যে যেন পলক ফেলতে ভুলে গেলেন। ওর দেহ মনে যেন লাবণ্যের নতুন জোয়ার এসেছে, বাঁচবার নতুন সার্থকতা। দীর্ঘ দিনের সংস্কারবদ্ধ মনকে ধিক্কার দিলেন ভুবনবাবু। এ সম্ভাবনার কথা যদি তাঁর আরো চার বছর আগে মনে পড়ত, তাহলে এই ব্যর্থ কৃচ্ছ্রসাধনে ওর জীবনের এতগুলি দিন এমন ক'রে নষ্ট হয়ে যেত না।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে চিন্মোহনের দিকে তাকিয়ে ভুবনবাবু বললেন, 'একটা কথা নিশ্চিত ক'রে জেনে নেওয়া দরকার চিন্মোহন। তোমরা দুজনেই বয়ঃপ্রাপ্ত, সে হিসেবে ভালোমন্দ সমস্ত বোঝাপড়া নিজেরাই ক'রে নিতে পার, মাঝখান থেকে আমার হস্তক্ষেপের অবশ্য কোনো প্রয়োজন নেই,—'

চিন্মোহন বাধা দিয়ে বলল, 'না না তা কেন, অভিভাবক হিসেবে নিশ্চয়ই আপনার অনেক কিছু জানবার থাকতে পারে।'

ভুবনবাবু হাসলেন, 'সে কথা থাক। নিতান্ত শুভাকাঙ্খী হিসেবেই কয়েকটা কথা স্পষ্ট বুঝতে চাই। নতুন কিছু নয়। সে দিন তুমি যখন আমার কাছে কথাটা প্রস্তাব করেছিলে তখন আমি যা জিজ্ঞেসা করেছিলাম তার জবাব তো এখনো পাইনি চিন্মোহন।'

চিন্মোহন বলল, 'হ্যাঁ। খোলাখুলিভাবেই আমি সকলের সঙ্গে আলোচনা করেছি। দাদা তো সম্পূর্ণ সমর্থনই করেন। অনেক ক'রে বুঝিয়ে বলবার পর মায়ের সম্মতিও শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। হয় তো সেটা

তাঁর সানন্দ সম্মতি নয়, কিন্তু এ ধরণের কিছু কিছু প্রতিকূলতার মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তি অমিতার আছে বলেই আমি জানি। যদি নাই পারেন তাতেই বা ক্ষতি কি। বর্তমান যুগের বিবাহটা ব্যক্তিগত, পরিবারগত নয়।'

ভুবনবাবু এবারও একটু মৃদু হাসলেন, 'সে কথা সত্য। কিন্তু পরিবার আর সমাজ—কয়েকজন জ্ঞাতি বন্ধু নিয়ে সে সমাজের গণ্ডী যত ছোটই হোক তাকে অস্বীকার করা অত সহজ নয়। জীবনে কিসের যে কতটুকু প্রভাব তার হিসেব কি খুব সহজ চিন্মোহন?'

ভুবনবাবুর কথার শেষের দিকটায় যেন একটু ক্লান্ত করুণ সুর বেজে উঠল। ইতিহাসটা চিন্মোহনের কিছু কিছু জানা। নিজের সম্পর্কিত পিসতুতো বোনকে বিয়ে করেছিলেন ভুবনবাবু। মাত্র এইটুকু অবৈধতায় পরিবারের সঙ্গে আজীবন তাঁদের বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়েছে। সেই নিঃসঙ্গ রুক্ষতা তাঁদের দাম্পত্যজীবনকেও স্পর্শ করতে ছাড়েনি।

চিন্মোহন চুপ ক'রে রইল। কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে অমিতা বলল, 'যাই বাবা চা করে আনি।'

ভুবনবাবু সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন।

সপ্তাহখানেক সময় নিয়েছিল অমিতা। সপ্তাহের শেষে আরো এক সপ্তাহ সময় চাইল। কিন্তু অসহিষ্ণু চিন্মোহন মাথা নাড়ল, 'না আর সময় তুমি পাবে না। আয়ুর সমস্ত সপ্তাহই তাহলে এমনি একটি একটি ক'রে কাটবে। আর বিলম্ব নয়। যা হয় কালই।'

ওর এই অসহিষ্ণুতা মাঝে মাঝে বেশ লাগে অমিতার। আরো বেশি অসহিষ্ণু, বেশি রূঢ় যদি হয়ে উঠত চিন্মোহন, তাহলে অমিতার দায়িত্ব যেন আরো অনেক কমত। তার সমস্ত দ্বিধাসংশয়ের তন্তু নির্দয় হাতে

উন্মোচিত ক'রে ফেলুক চিন্মোহন। অমিতা বাধা দেবে না।

স্থির হোলো বিয়ে হবে রেজেষ্ট্রি করেই, তবু চিন্মোহনের পারিবারিক সন্তুষ্টির জন্যে হিন্দু অনুষ্ঠানগুলিও পালন করা হবে।

লজ্জায় কণ্টকিত হয়ে ওঠে অমিতার মন। আবার সেই অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তি। কিছুতেই মন সাড়া দেয় না।

একটু চুপ ক'রে থেকে অমিতা বলে, 'ওগুলি কি না করলেই নয়।'

চিন্মোহন বলে, আমার জন্যে ওগুলি নিতান্তই অনাবশ্যক কিন্তু আত্মীয় স্বজনের জন্যে কিছুটা প্রয়োজন আছে বইকি। তবু জিনিসগুলি যে বিরক্তিকর সন্দেহ নেই। কত যে অসংখ্য মেয়েলি আচারের মধ্য দিয়ে পার হতে হয় তার ঠিক নেই। 'তবু' চিন্মোহন মিষ্টি একটু হাসল, 'তবু একবারের অভিজ্ঞতা তোমার যখন হয়েছে তত অসুবিধা হবে না বোধ হয়। কিন্তু ওদের পাল্লায় পড়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ আমার দশাটা কি হবে ভেবে দেখ তো।'

হঠাৎ ভারি বিবর্ণ দেখাল অমিতার মুখ। চিন্মোহন বিস্মিত হয়ে বলল, 'কি হোলো ?'

ম্লান হাসল অমিতা, 'কি আবার হবে !'

কিন্তু কি যে হয়েছে তা বুঝতে বাকি নেই চিন্মোহনের। অমিতার পূর্বজীবন সম্বন্ধে পারতপক্ষে কোনোদিন কোনো কৌতূহল চিন্মোহন প্রকাশ করেনি, এ প্রসঙ্গ সতর্কভাবে সে বরং এড়িয়েই যায়। তবু কোনো মুহূর্তে তার উল্লেখ মাত্রেই অমিতা যদি এমন আঘাত পায়, এতটা অসহায় বোধ করে, তাই বা কি ক'রে চিন্মোহন সহ্য করবে ? বয়স এবং অভিজ্ঞতা কি কম হয়েছে অমিতার যে তার মন আজো এতখানি স্পর্শকাতর থাকবে।

'একটা কথা আজ একটু খোলাখুলিভাবে আলোচনা করতে চাই অমিতা।' চিন্মোহনের কণ্ঠ একটু রূঢ় এবং গম্ভীর শোনাল।

'বল।'

'তোমার পূর্বজীবনের প্রসঙ্গ এতকাল সযত্নে দুজনে আমরা এড়িয়েই গেছি। কিন্তু ফল তাতে ভালো হয়নি দেখা যাচ্ছে। এর চেয়ে খোলা-খুলিভাবে আলোচনাই বরং ভালো। বেদনা আর দুর্বলতার স্থানকে লুকিয়ে রেখে কাজ নেই। অমূল্যবাবুকে তুমি আজো ভুলতে পারনি, এই তো স্বাভাবিক। এজন্যে আমার কোনো ঈর্ষাও নেই, ক্ষোভও নেই। আমার শুধু দুঃখ এই, তাঁর কথা আমার কাছে থেকে তুমি সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাখতে চাও। অন্যান্য প্রসঙ্গের মত তাঁর কথাও এমনকি তোমাদের সে দাম্পত্যজীবনের খুঁটিনাটি কাহিনী পর্যন্তও দুজনে আমরা আলোচনা করতে পারি।'

অমিতা অদ্ভুত একটু হাসল, 'প্লানটা যেমন ভালো তেমনি কৃত্রিম। জীবনকে সব সময় অমন ফরমূলায় বাঁধা যায় বলে কি মনে হয় তোমার?'

চিন্মোহন বলল, 'বেঁধে নিতে পারলে অনেক সময় কিন্তু ভালোই হয়। নিজেদের গড়া যে বাঁধন তাকে ভয় কিসের, সে তো ছন্দের বাঁধনের মত। বিয়েকেও তো লোকে বন্ধন বলে।'

মনে মনে যত বিরূপতাই থাক মুহূর্তের জন্যে সকলে মুগ্ধই হলেন। রূপ যেমন আছে, সংযত রুচিও তেমনি। বয়স যতটা বেশি বলে শোনা গিয়েছিল, মুখে ততখানি ছাপ পড়েনি। বিদ্যার সঙ্গে বন্দুকের সঙ্গীনের মত তীক্ষ্ণাগ্র অহংকার উঁচু হয়ে নেই। শুধু চিন্মোহনের সঙ্গেই তার সম্পর্ক নয়, পরিবারের সকলের সঙ্গেই অন্তরঙ্গ হতে অমিতা উৎসুক।

তবু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অমিতার মনে অস্বস্তির গোপন কাঁটা কোত্থেকে

এসে বিঁধতে লাগল। মন্দাকিনীকে প্রণাম করতে গেলে তিনি হঠাৎ পা সরিয়ে নিলেন, 'থাক্ থাক্।'

অপ্রতিভ হয়ে অমিতাকে সরে দাঁড়াতে হোলো।

বাইরের ঘরে শোনা গেল চিন্মোনের বড় ভাই মনোমোহন বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে বন্ধুদের কাছে বক্তৃতা করছেন, 'আমি বেশ ভেবেচিন্তে ইচ্ছা করেই মত দিয়েছি, বুঝলে বন্ধু। এমন সচেতন চেষ্টা ছাড়া বিধবাবিবাহ আমাদের সমাজে প্রচলিতই হবে না। লজ্জা আর সংস্কারের জড়তা এমন জোর করেই ঘুচানো দরকার।'

অমিতা সেখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে যায়।

খেতে বসেও অসুবিধার অন্ত নেই। পুরুষদের খাওয়া হয়ে গেলে চিন্মোহনের বোন সুনন্দা আর তার বউদি সরমার সঙ্গে অমিতাকে খেতে দেওয়া হোলো। পরিবেশনের ভার নিয়েছে সম্পর্কিত এক ঠানদি। বিবাহাদি ব্যাপারে খাটতে যেমন তিনি পারেন তেমনি পারেন কথা বলতে। তাঁর রসনার সরসতার খ্যাতি আছে পাড়ায়।

নিরামিষ আমিষ নানারকমের তরকারি। কিন্তু অমিতা শুধু নিরামিষ তরকারি দিয়েই খেয়ে চলেছে। আমিষ একটাও সে স্পর্শ পর্যন্ত করছে না। ঠানদি তা লক্ষ্য ক'রে বললেন, 'ওমা নতুন বউ যে মাছের তরকারি একটাও ছুঁয়ে দেখলে না। এত কষ্ট ক'রে রাঁধলুম তো ভাই তোমার জন্যেই।'

সলজ্জভাবে অমিতা বলল, 'আজ থাক।'

'ওমা থাকবে কেন, সধবার যে রোজ মাছ খেতে হয়।'

সুনন্দা বলল, 'খান বউদি চমৎকার হয়েছে।'

সরমাও বলল, 'একটা তরকারি অন্ততঃ খাও।'

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে একটুকরো মাছ মুখে দিল অমিতা। কিন্তু সঙ্গে

সঙ্গেই দুঃসহ বিবমিষায় ভাতের গ্রাসটা সে ঢেলে ফেলল মেঝের ওপর। সবাই অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। লজ্জায় আর অস্বস্তিতে প্রত্যেকটি মুহূর্তে অসহনীয় লাগতে লাগল অমিতার।

ঠানদি কিছুক্ষণ নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলেন। তারপর হঠাৎ কি মনে পড়ে যাওয়ায় তিনি মুখ টিপে হাসতে লাগলেন। 'ও তাই বল। তা চিনুর সঙ্গে ভাব তো নাতবউয়ের শুনেছি অনেকদিন থেকেই। বিয়ে যে হবে এ তো প্রথম থেকেই জানত। মাছকোচ খাওয়ার অভ্যাসটা তখন থেকে আরম্ভ করলেই তো হোতো। তাহলে আর এমন অসুবিধায় পড়তে হোতো না। সে সব বিধিনিষেধ তো আর সকলের জন্যে নয়।'

অমিতা চেয়ে দেখল, সকলের মুখে কৌতুকের হাসি ফুটে উঠেছে।

খেয়ে দেয়ে উঠে সুনন্দা বলল, 'ঠানদি চিরকালই ভারি ঠোঁটকাটা, আপনি কিছু মনে করবেন না বৌদি।'

অমিতা নীরবে ম্লান একটু হাসল। বাইরের আচার-আচরণ নিয়ে এমন আকস্মিক অসুবিধায় পড়তে হবে, নানা অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে এ ধারণা তার কিছুতেই মাথায় আসেনি।

সুনন্দা সহানুভূতির স্বরে বলল, 'গা বমি বমি লাগছে নাকি এখনো? একটা পান খেয়ে দেখুন না বউদি, সেরে যাবে।'

অমিতা বলল, 'পান তো আমি খাইনে।'

সুনন্দা হাসল, 'খান না বলে কি এখনো খেতে হবে না নাকি? আমিই কি সবদিন খাই? কিন্তু নিমন্ত্রণ টিমন্ত্রণের পর পান খেলে ভারি চমৎকার লাগে। দাঁড়ান আমি সেজে আনছি, ভালো যদি না লাগে কি বলেছি। চৌদ্দপনের বছরের কিশোরী মেয়ে। ওর নিজের ভালো লাগার স্রোতে

অন্যের অসুবিধাটা ও ভাসিয়ে নিয়ে যায়। স্কুলে এমন অনেক ছাত্রীর সঙ্গে নিত্য পরিচয় হয়েছে অমিতার, কিন্তু কারো সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ট ভাবে মিশতে পারেনি।

সারাদিনের মধ্যে চিন্মোহনের আর সাক্ষাৎ নেই। ভিড়ের মধ্যে বাইরে বাইরে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে; তাকে দেখাই যায় না আর। মনে মনে অমিতা হাসে। এতদিনের সেই সপ্রতিভ চিন্মোহন বিয়ের পর হঠাৎ এমন লাজুক হয়ে উঠলো কি ক'রে।

সন্ধ্যায় সরমা আর সুনন্দা প্রসাধনের নানা উপকরণ নিয়ে বসল, অমিতাকে নিজেদের পছন্দ মত সাজাবে।

বিব্রত হয়ে অমিতা বলল, 'এ সব কেন এত ?'

সুনন্দা বলল, 'কেন নয় ? আগের মত আজো কি সেই সাদা—'

চোখের ইসারায় সরমা তাকে নিষেধ ক'রে বলল, 'ছি।'

অমিতা ছেড়ে দিয়েছে নিজেকে। তাকে নিয়ে যা খুশি করুক ওরা। অস্বস্তি প্রথমটায় লাগলেও এ ধরনের আত্মসমর্পনে অদ্ভুত তৃপ্তিও যে একরকম পাওয়া যায় তা যেন বহুকাল পরে আবার নতুন করে অনুভব করল অমিতা। এ যেন আর কেউ, আর কারো শরীর। সুনন্দাদের একজন হয়ে অমিতাও যেন কৌতুক বোধ করছে।

আলতায় দুটো পা একেবারে লেপে দিয়েছে সুনন্দা। কপাল আর সিঁথি নিয়ে পড়েছে সরমা। সিঁদুরের সূক্ষ্ম রেখায় তার তৃপ্তি নেই। নিজের মত ক'রে অমিতার সিঁথিও সম্পূর্ণ সে এয়োতির চিহ্নে উজ্জ্বল ক'রে তুলল। কপালে বড় ক'রে এঁকে দিল সিঁদুরের ফোঁটা। কে বলবে বিধবার বেশে পাঁচ পাঁচটি বছর কাটিয়ে এসেছে অমিতা। খাওয়া দাওয়ার পর সুনন্দার পাল্লায় পড়ে এ বেলাও পান খেতে হোলো। তাছাড়া দীর্ঘদিন পরে হলেও পানের স্বাদটা অমিতার ভালোই

লেগেছে।

সাজিয়ে গুজিয়ে সুনন্দা তাকে ঠেলে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল নিজের বড় দেয়াল আয়নাটার সামনে, 'দেখুন কি চমৎকার মানিয়েছে, আমূল বদলে গেছেন একেবারে। নিজেকে নিজে চিনতে পারছেন তো?'

মৃদু হাসল অমিতা, 'না পারাইতো ভালো।'

হাতের তালুতে মাথা রেখে কি একটা বই পড়ছিল চিন্মোহন। অমিতাকে দেখে হঠাৎ চমকে উঠল।

'একি হয়েছে?'

অমিতাও একটু বিস্মিত হোলো, 'কেন, কি আবার হবে।'

চিন্মোহন যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না, 'তোমাকে এমন বিশ্রী সঙ সাজাল কে।'

কথার ভঙ্গিটা কেমন যেন দুঃসহ লাগল অমিতার, বলল, 'কে আবার সাজাবে? আমি নিজেই সেজেছি। কেন খুব খারাপ লাগছে নাকি?

চিন্মোহনের ঠোঁটে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল, 'না না না, অতি চমৎকার, অতি চমৎকার। দশ বছর বয়স কমে গেছে তোমার। একেবারে চতুর্দশী বালিকা বধূ।'

এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে চমকে উঠে চোখ তুলতেই অমিতা দেখতে পেল চিন্মোহনের শিয়রের খানিকটা ওপরে, দেয়ালে টাঙানো দিন কয়েক আগেকার অমিতারই একখানা ফটো। নিচে সযত্নে লেখা, মহাশ্বেতা।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অমিতা। এই বিচিত্র বর্ণবাসের অন্তরালে তার মন মরুভূমির রিক্ততায় ধূ ধূ করছে।

কুমারী শুক্লা

একটু দূর থেকেই চূণকামের উগ্র গন্ধটা নাকে আসে। এই ক'দিন আগেই নিজের গরজে শুক্লা বাড়িটায় চূণকাম করিয়েছে। বাড়ির যিনি মালিক তিনি থাকেন কাশীতে। মাস অন্তে ভাড়াটা পেলেই হোলো। আর কোনোদিকে লক্ষ্য নেই। আর যারা বাসিন্দা, অন্য সব শিক্ষয়িত্রী আর ছাত্রীরা, তাদের নজরও এদিকে ভারি কম; মাথাগুঁজে কোনো রকম ক'রে থাকতে পারলেই তাদের চলে যায়। ভালো লাগে না কেবল শুক্লার। অপরিচ্ছন্ন ঘরে মন তার আরো অপ্রসন্ন, মেজাজ আরো খিটখিটে হয়ে ওঠে। নিজেকেই যেন নিজে সহ্য করা যায় না। গন্ধটা কিন্তু বেশ। ওদের কাছে চূণকামের গন্ধটা কেন যে খারাপ লাগে, তা শুক্লা বুঝে উঠতে পারে না; তার তো বেশ লাগে।

এত চেষ্টাতেও বাড়িটার পৌরাণিকতা সবটুকু ঢাকা পড়েনি, তবু বাইরে থেকে এখন সাদা ছোট্ট বাড়িটাকে বেশ ভালোই দেখা যায়। আর এদিকটাই সব চেয়ে সুন্দর শহরটির। একটি কুঁড়ে ঘরকেও চমৎকার মানাত এখানে। কোনোরকম কোলাহল গোলমাল নেই, নেই দোকানপাটের ভিড়। শহর আগেই যেন শেষ হয়েছে, এটা সীমান্ত—শহর আর গ্রামের। খানিকটা দূরে পূবের দিকে বড় রকমের একটা মাঠ। অবশ্য এখন এই বর্ষার সময় মাঠ বলে মোটেই আর তাকে মনে হয় না। পাটগুলি কেটে নিয়ে যাওয়ায় দিগন্ত পর্যন্ত খালি জলই চোখে পড়ে

কালো রঙের। সাগর কি এমন স্থির নিস্তরঙ্গ? সমুদ্র অবশ্য শুক্লার কোনদিন দেখা হয়ে ওঠেনি, যদিও সুযোগ মাঝে মাঝে এক-আধটু এসেছে, কিন্তু সব সুযোগই কি গ্রহণ করা যায়? মাঝে মাঝে দু'একখানা ধানের ক্ষেত। বেশ লাগে দেখতে। খানিকটা উঁচু সবুজ জমি যেন জলের ওপর ভেসে রয়েছে। সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপগুলিও বোধ হয় এমনিই দেখতে।

ঢুকতে না ঢুকতেই ঝি ক্ষীরোদা এসে গেটের সামনে দাঁড়িয়েছে, 'আপনার দু'খানা চিঠি এসেছে বড়দিদিমণি। জানালা দিয়ে আপনার ঘরের টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছি।'

মিশি-রঞ্জিত ঠোঁটে বিদ্যুতের মত এক ঝলক হাসি খেলে যায় ক্ষীরোদার।

শুক্লা গম্ভীর ভাবে বলে, 'বেশ করেছ। কিন্তু আবার তুমি মিশি দিতে শুরু করেছ ক্ষীরোদা? না তোমাকে নিয়ে আমি আর পেরে উঠলুম না। আমি তো বলে দিয়েছি, এর চেয়ে তুমি হুঁকো টানো, সেও সহ্য হবে। মনে রেখ, বার বার এই শেষবার।

ক্ষুণ্ণ হয়ে ক্ষীরোদা পিছিয়ে যায়। বাপরে একেবারে মেম সাহেবের মেজাজ! অনেক জায়গায় সে চাকরি করেছে, কিন্তু এমন বদ্‌মেজাজি মেয়েমানুষ সে যদি আর দুটো দেখে থাকে।

চিঠি। আজও মাঝে মাঝে চিঠি আসে শুক্লার নামে। জীবনে এত চিঠি সে পেয়েছে যে সব যদি রাখত, তাহলে শুধু চিঠি দিয়েই বোধ হয় নিজেকে ঢেকে রাখতে পারত। কিন্তু সত্যি, শুধু চিঠি দিয়েই কি নিজেকে ঢেকে রাখা যায়? কি লাভ চিঠি জমিয়ে জমিয়ে? কাগজগুলি বিবর্ণ হয়ে ওঠে, অক্ষরগুলি আসে অস্পষ্ট হয়ে। বাক্সে, দেরাজে

এনভেলপের বাণ্ডিল রাশের পর রাশ জমে ওঠে। ভাবতে ভালো লাগে, একদিন খুলে দেখা যাবে। কিন্তু খোলা আর হয়ে ওঠে না। তারপর হঠাৎ একদিন সমস্ত জড় ক'রে শুক্লা ছিঁড়ে ফেলে কিংবা পুড়িয়ে দেয়। আর ঠিক পর মুহূর্তেই মনে হতে থাকে, নষ্ট না করলেই বা কি ক্ষতি ছিল?

তবু নতুন চিঠি পেতে আজও ভাল লাগে। চিঠি। সোনার অলঙ্কারের মত আজও মধুর নিক্কনে বাজতে থাকে শব্দটা। কি না থাকতে পারে ঐ শাদা একখানা এনভেলপের মধ্যে! কত সম্ভাবনা আর বিস্ময়ের বিচিত্র রঙই না বয়ে আনতে পারে ইচ্ছা করলে।

মেয়েদের সাপ্তাহিক পরীক্ষার খাতাগুলি টেবিলের ওপর রেখে ঘরের বাকি জানালা কয়েকটাও শুক্লা খুলে ফেলে। একঝলক হাওয়া এসে টেবিলের ধারের ক্যালেণ্ডারটার পাতা উল্টোতে থাকে পত্‌পত্‌ ক'রে। আলগোছে প্রথম এনভেলপটা শুক্লা তুলে নিল, ওপরের হাতের লেখাটা দেখে একটু চমকে উঠল। এতদিন পরে প্রশান্ত আবার তাকে চিঠি লিখেছে! এনভেলপের কিনারাটা ছিঁড়তে গিয়ে হাতটা একটু হয়ত কেঁপে উঠল। অতি সংক্ষিপ্ত একটুকরো চিঠি। প্রশান্ত লিখেছে, শুক্লা, কুশ্রী ব্যাধিতে হাসপাতালে পচে মরছি, এলে শেষ দেখা হতে পারে।

শুক্লা বেশ দৃঢ় হয়ে রইল, বিচলিত হতে নিজের কাছেও সে লজ্জাবোধ করে! যন্ত্রবৎ দ্বিতীয় চিঠিখানাও শুক্লা খুলে ফেলল। চিঠিখানা অমলেন্দুর। এও সংক্ষিপ্ত।

শেষ পর্যন্ত বিয়ে করাটাই ঠিক হোলো, শুক্লা। পণের টাকায় বাবার ঋণের ভার অন্তত খানিকটা তো লাঘব হবে। স্নিগ্ধ সরল কৈশোরের সংস্পর্শে নবত্বলাভের বৃথা আশা তোমার মত আমার নেই, সে চেষ্টা

তুমিও তো করেছিলে। কৌতুকের আর একটা নতুন ক্ষেত্র তো পাব, সেই হোলো আনন্দ। পরম বন্ধু হিসাবে তোমার নিমন্ত্রণ রইল।

ও ঘরটা মেয়েদের কল্লোলে মুখর হয়ে উঠেছে ; তার মৃদুগুঞ্জন এদিকেও ভেসে আসছে। প্রতিমার গলা উঁচু হয়ে উঠেছে সব চেয়ে। এতক্ষণ সব মেয়েরা বোধ হয় তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ক'দিনেই মেয়েদের কাছে বেশ পপুলার হয়ে উঠেছে। সকলের সঙ্গেই তার সখিত্ব। হাসতেও যেমন পারে, হাসাতেও পারে তেমনি প্রতিমা। এক এক সময় ভারি ঈর্ষা হয় শুক্লার। সেও যদি নিজেকে অমনি ছেড়ে দিতে পারত, অমনি তরল হয়ে মিশে যেতে পারত সকলের সঙ্গে ; কিন্তু শুক্লা বেশ জানে কিছুতেই তা সে পেরে উঠবে না। জোর ক'রে চেষ্টা করতে গিয়ে অনর্থক নিজেকেই সে হাস্যকর ক'রে তুলবে, কাউকে সে হাসাতে পারবে না। তার চেয়ে এই ভালো, ভয় আর শ্রদ্ধার দূরত্ব, সম্মান আর আভিজাত্যের নিঃসঙ্গতা।

শুক্লা জোর করেই মেয়েদের খাতাগুলি টেনে নিল। কিছুতেই সে বিচলিত হবে না, তার দৃঢ়তা টলবে না কিছুতে। একটু পরে কবিতা আবৃত্তি করতে করতে সেকেণ্ড টিচার অরুণা ঢুকল ঘরে। এই একটি মেয়ে তাকে কিছুতেই সমীহ করে না ; বিদ্রূপে, পরিহাসে জোর করেই শুক্লাকে সে দলে টেনে নামাবে। মাঝে মাঝে অবশ্য দুঃসহ মনে হয়, কিন্তু একেক সময় বেশ লাগে ওর হাতে নিজেকে ছেড়ে দিতে।

'অস্তরবির রশ্মি আভায়
খোলা জানালার ধারে—'

কুমারী শুক্লা কি করছেন বসে বসে ?'

শুক্লা একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বলল, 'কাব্যকাহিনী পাঠ করছেন না —দেখতেই পাচ্ছিস, অঙ্কের খাতা দেখতে হয় আজকালকার শুক্লাকে।'

অরুণা বলল, 'কিন্তু সে কি শনিবারই ছুটির পর? আচ্ছা দাও আমি দেখে দিচ্ছি।' খাতা ক'খানা জোর ক'রে তুলে নিতেই খোলা চিঠিখানা চোখে পড়ে গেল অরুণার।

'ও বাবা, তবে নাকি কাহিনী নয়? পড়ব শুক্লাদি?'

অন্যের জীবন রহস্যের সম্বন্ধে অদ্ভুত কৌতূহল আর অনুসন্ধিৎসা অরুণার। তার বয়স, শিক্ষা, সুরুচিও তাদের সম্পূর্ণ সংহত করতে পারেনি। অন্যদিন হলে শুক্লা তাকে কঠিন ভর্ৎসনায় লাঞ্ছিত করত, ছিনিয়ে নিয়ে যেত চিঠি, কিন্তু আজ সে নিশ্চল হয়ে রইল। দেখুক ও। রহস্য যখন শেষ হয়ে গেল, তখন আর অনাবৃত করতে ক্ষতি কি। আর অনাবৃত না করেই কি শুক্লা আজ থাকতে পারবে?

'আচ্ছা পড়।'

অরুণা বলল, 'না থাক, তুমি হয় তো মনে মনে রাগ করছ।'

ম্লান হেসে শুক্লা বলল, 'না রাগ করছিনে, পড় তুই।' একটু পরে শুক্লা আবার অরুণার দিকে চোখ ফিরাল।

'কিছু বুঝতে পারলি?'

'সামান্য। কন্‌টেক্‌স্ট না হলে কি সবটা বোঝা যায়?'

'কন্‌টেক্‌স্ট? আচ্ছা শোন।'

নিজেকে নগ্ন করতে আজ অদ্ভুত আনন্দ পাচ্ছে শুক্লা।

'আমি মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছি। ততক্ষণে তুই দু'কাপ চা কর দেখি। ঐ কোণটায় সব রয়েছে দেখ।'

বোর্ডিং-এর মধ্যে চা তৈরিতে সবচেয়ে দক্ষ অরুণা। মিনিট কয়েকের মধ্যেই সে দু'কাপ চা এনে রাখল টেবিলের ওপর। এক কোণে আর একটা চেয়ারের ওপর একরাশ বই ছিল। সেগুলিকে নিচে নামিয়ে রেখে

চেয়ারটা এগিয়ে নিয়ে এল টেবিলের কাছে, দরজাটা দিয়ে এল ভেজিয়ে। শুক্লা অদ্ভুত একটু হেসে আরম্ভ করল, 'বুঝতেই তো পারছিস, ঐ দু'জন লোকের সঙ্গে আমার খানিকটা হৃদয়গত সম্পর্ক ছিল।'

অরুণা বলল, 'হ্যাঁ, সেটা দুর্বোধ্য নয়!'

'বছর দশেক আগে প্রথম পত্রলেখক প্রশান্তের সঙ্গে আমার বিয়ে সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের মাসখানেক আগে এমনি একটা ছোট্ট সুন্দর সহরে আমাদের দুই পরিবার পাশাপাশি দুটো বাড়ি ভাড়া নিয়ে ছিল। পারিবারিক বিরোধহীন আমরা ছিলাম সুখী রোমিও জুলিয়েট। প্রশান্তের ছিল শুধু মা; তিনি তখনো এসে পৌছাননি। আমাদের পরিবারও তখন বড় ছিল না; মা, বাবা, ঠাকুরমা আর ছিলেন সোনাকাকা। দিন তারিখ সব জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। তার আগে বহুদিন ধরে চলছিল আমাদের মন জানাজানির পালা।

সেদিন কেবল ভোর হয়েছে, বাগানের ধারের ছোট খোলা বারান্দায় ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে আমি দাঁত মাজছি। পেষ্টের সাদা ফেনায় মুখ ভরে যাচ্ছে, এমন সময় একটা সাদা গোলাপের তোড়া হাতে প্রশান্ত এসে উপস্থিত হোলো। তোর মতই তখন সারাটা দিন সে কেবল কবিতা আবৃত্তি করত, কিন্তু লিখতে পারতো না। ছবি আঁকার হাত ছিল সামান্য, কিন্তু সখ ছিল অসামান্য চিত্রকর হবার। আমার দিকে ত প্রশান্ত হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে অদ্ভুত কঠিনভাবে বলল, এখান থেকে উঠে গিয়ে দাঁত মাজ শুক্লা। পরিষ্কার দাঁত দেখতে বেশ ভালো কিন্তু দাঁত পরিষ্কার করা মোটেই দেখতে পারা যায় না, অত্যন্ত কুৎসিত, ভালগার, বীভৎস।

তুই হাসছিস? গোড়ায় অবশ্য ব্যাপারটা হাসিরই ছিল। আমিও হেসে উঠেছিলাম, ফলে খানিকটা ফেনা লেগে গিয়েছিল অমন চমৎকার

শাড়িটায়। কিন্তু প্রশান্তের রাগ আরো বেড়ে উঠল ; চেঁচিয়ে বলল, হাসছ, লজ্জা করছে না ? এমন নির্লজ্জতা শিখলে কোত্থেকে ? যাও, আমার সামনের থেকে যাও—যাও বলছি—।

আমার মেজাজও গরম হয়ে উঠল, ইতরতা আমিও সহ্য করতে পারিনে। বললাম, ভুলে যাচ্ছ যে বাড়িটা আমাদের, ইচ্ছে হলে তুমিই বরং এখান থেকে চলে যেতে পার।

প্রশান্ত বলল, ও আচ্ছা বেশ।

ভাবলুম এইতো স্বাধীনতা আমাদের স্বাধীনতা দেওয়া, কালচারড্ করাটাও ওদের একটা লীলা। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে নিজের পদমর্যাদা বাড়াবার জন্যেই শিক্ষিতা স্ত্রী কি প্রণয়িনী ওদের দরকার ? আমাদের যথার্থ শিক্ষা, যথার্থ স্বাধীনতা ওরা চায় না। স্বাধীনতা মানে —ওদের রুচি অনুযায়ী চলা, ওদের নির্বাচিত বই পড়া, ওদের খুশি অনুযায়ী প্রসাধন, ওদের বেছে দেওয়া বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা। তবু তো স্ত্রী হতে হয়নি এখনো। মনে মনে সংকল্প করলুম কখনো হবোও না।

প্রশান্তও এলো না। ওর আঘাতটা ছিল অন্য রকমের—সেটা অসৌন্দর্যের। আমার সেই মুহূর্তের কুৎসিত মূর্তিটাই ওর মনে চিরস্থায়ী হয়ে রইল। আর ঠিক সেদিনই কাউকে না জানিয়ে ও ক'লকাতা চলে গেল। ওর মনের ভাবটা বুঝতে আমার দেরি হোলো না। কিন্তু এতকাল যা ভালো লেগেছিল, এই মুহূর্তে ওর সেই কবিয়ানাই আমাকে আরো ক্রুদ্ধ ক'রে তুলল। কি হবে এই দুর্বল কাদার পুতুল নিয়ে ? বাস্তব জগতে কতটুকু ওর মূল্য, কতটুকু নির্ভর করা যাবে ওর ওপর ? আর এই ক্ষণভঙ্গুর কাঁচের আলমারীর মত প্রেম ! অতি সযত্নে, অতি সাবধানে যাকে রাখতে হয় ; রঙীন বুদ্‌বুদের মত যা অবান্তর আর হাস্যকর—কি হবে সেই প্রেম দিয়ে।

প্রশান্ত এল না। আমি ফটোগ্রাফার ডাকিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে ছবি তুললাম, ওকে দেখাবার জন্যে। তবু ও ফিরল না। রঙীন বুদ্‌বুদের মতই ও মিলিয়ে গেল। ভালোই হোলো। ওর নিজের যথার্থ মূল্য এতদিনে টের পাওয়া গেল, নিঃসংশয় হওয়া গেল ওর প্রেমের আয়ু আর সত্যতা সম্বন্ধে। এতকাল যেন কেটেছে খেলার খেলায়, এখন শক্ত হতেই মজা লাগছে, মজা লাগছে নিজের সঙ্গে যুঝতে, নিজেকে অস্বীকার করতে, গুঁড়ো গুঁড়ো ক'রে ভেঙ্গে ফেলতে আনন্দ লাগছে সেই সাজানো কাঁচের আলমারীকে।

বাবা বললেন, দূর হয়ে যা হারামজাদী, লেখাপড়া শিখেছিস বলেই কি স্বেচ্ছাচারিণী হতে হবে? তা আমার বাড়িতে বসে চলবে না।

মা বললেন, আহা এমন সম্বন্ধটা হাত ছাড়া হয়ে গেল, এই বুড়োধাড়ী মেয়েকে কে শেষে বিয়ে করবে। বাবাকে বললেন, তোমারই তো দোষ। আমি আগেই বলেছিলাম, অত আদর দিও না, সময়মত বিয়ে দিয়ে দাও।

ঠাকুরমা বললেন, তোদের জ্বালায় আমি কি গলায় দড়ি দিয়ে মরব? লোকের কাছে মুখ দেখাবার আর জো রইল না। যেমন ম্লেচ্ছ আচার শিখিয়েছে তেমনই তো হবে? বিয়ের চাইতে এখন উড়ে উড়ে বেড়াবারই ওর ইচ্ছা। এমন তো হবেই, নামটা পর্যন্ত ম্লেচ্ছ রেখেছে। আমি তখনই ছোট খোকাকে বলেছিলুম, ভালো দেখে একটা ঠাকুর দেবতার নাম রাখ। স্বভাবও হবে ওর ঠাকুরদেবতার মত। তা না,—কি একটা নাম রেখেছে শুক্লা না কি মুখেও আসে না ছাই, মুখে আনতে আমি চাইওনে।

নামরক্ষক সোনাকাকা গম্ভীর হয়ে তাঁর আইনের বইতে মন দিলেন। কোনো মন্তব্য করলেন না।

তিন চার বছর পরে দ্বিতীয় সর্গের যখন শুরু তখন আমাদের সংসারের কিছু কিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে। সোনাকাকা ওকালতি পাশ করে মহকুমা শহরে গিয়ে বসেছেন, কিন্তু বাসা খরচ প্রতিমাসে উঠছে না। বাবার সামান্য একটু লোভের জন্যে কাস্টমস হাউসের অতদিনের ভাল চাকরিটা তখন গেছে, আর কোনো চাকরি জোটেনি, দেশের বাড়িতে বসে বসে মেজাজ দিনের পর দিন খারাপ ক'রে তুলেছেন, মার সঙ্গে ঝগড়া করছেন, ঠাকুরমার সঙ্গে করছেন বকাবকি। মুখচোরা ভাইকে ওকালতি পড়িয়েছেন বলে অনুতাপ করছেন প্রত্যেকদিন। আর আমি বি, টি পাশ করে বর্ধমানে একটা মাষ্টারী কেবল পেয়েছি। অবশ্য সুর তখন থেকেই ফেরা আরম্ভ করেছে, সবাই বলছেন—ও ছেলের সঙ্গে বিয়ে না হয়ে আমার ভালোই হয়েছে। ঘরে অমন সুন্দরী বউ থাকা সত্বেও চরিত্র যার ঠিক থাকে না, তার সঙ্গে বিয়ে হলে দুঃখের অবধি থাকত না। এতদিন পরে ওর গুণপনা সব বেরিয়ে পড়ছে। মা আর আমার বিয়ের কথা বলছেন না, কারণ ইতিমধ্যে আমার ছোট একটি ভাই হয়েছে। আমার কাছে বাবার মেজাজ বেশ নরম; আর ছুটি ছাটায় বাড়িতে গিয়ে দেখি, যদিও দাঁত এখন প্রায় সবগুলিই পড়ে গেছে তবু ঠাকুরমার মুখে আমার নাম বেশ স্পষ্টই উচ্চারিত হয়, একটুও বাধে বলে মনে হয় না।

এমনি সময় ক'লকাতার মেডিক্যাল কলেজে চোখ দেখাতে গেছি, হঠাৎ পিছন থেকে কে ডেকে উঠল, আরে শুক্লাদি যে। চোখ ফেরাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। মুহূর্তের জন্যে চোখ নামিয়ে নিল অমলেন্দু। পরক্ষণেই সোজাসুজি চেয়ে বলল, আপনি এখানে!

চোখ দেখাতে এসেছি। তুমি?

পড়ছি, এবার থার্ড ইয়ার।

একটু পিঠচাপড়ানো ধরনেই বললুম, বেশ বেশ।

মামাবাড়ির পাশের বাড়িতেই ওদের বাড়ি। ছেলেবেলায় মামাদের গ্রামে যখন বেড়াতে যেতাম মাঝে মাঝে, ওকে দেখতুম খেলতে। ভারি ডানপিটে ধরনের ছেলে ; অল্প বয়সে ও গাছে চড়ায়, নৌকা বাওয়ায় বড় বড় ছেলেদের সঙ্গেও পাল্লা দিত। বয়সে আমার চেয়ে ছোটোই ছিল দু'তিন বছরের, পড়তও দু'ক্লাস নিচে। সেই অমলেন্দু এখন মাথায় বেশ বড় হয়ে উঠেছে। বেশ শক্ত স্বাস্থ্যবান চেহারা, দেখে বেশ ভালই লাগল। চোখ দেখিয়ে চশমা নেওয়ার ও-ই ব্যবস্থা ক'রে দিল। এই উপলক্ষে দু'তিনদিন আমাকে আসতে হোলো এবং সস্তায় ভালো চশমার জন্যে একদিন বাজার ভরে বিভিন্ন দোকানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হোলো। চশমা পরের দিনই পেয়ে গেলাম। অনুমান করতে বাকি রইল না—অদৃশ্য এক রঙীন চশমা অমলেন্দুও ইতিমধ্যে পরে বসেছে। কিন্তু অমলেন্দু বেশ চালাক দৃঢ়চরিত্রের ছেলে। সূক্ষ্ম রুচি আর মনের আভিজাত্য ওর প্রচুর, সহজে ধরা দেবার ছেলে ও নয়। আর যা সহজ তা আমিও চাইনে, যদি কিছু গড়ে ওঠে, কঠিন বাস্তবকে ভিত্তি করেই তা গড়ে উঠুক। রঙ নয়, ছবি নয়, কবিতা নয়, শক্ত বাস্তব কিছু চাই। বয়স কম হলে কি হবে, পাঠ্যাবস্থা থাকা সত্ত্বেও সংসারের নানা বিষয় ও দেখে, দেশের বিষয় সম্পত্তি সম্বন্ধে ও নিজেই খোঁজ-খবর নেয়। ওর বাবা গোঁড়া ব্রাহ্মণ। তিনিও পাকা বৈষয়িক। কিন্তু ও যেন ইতিমধ্যেই তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। তাঁকে ভয় করছে না, স্নেহ করছে। পরে দেখেছিলুম ভয়ের চেয়ে এই স্নেহ আরো কত অসহায়। চায়ের দোকানে চায়ের কাপ সামনে ক'রে যখন আমাদের আলাপ চলত, তখন এই সব বৈষয়িক আলোচনাই হোতো বেশি ; ওর বাবার কথা, বিষয় সম্পত্তির কথা, বিভিন্ন বিষয়ে ওর ব্যক্তিগত মতামতের কথা ও জোর দিয়ে বলত। রীতিমত

গন্ধময় আলোচনা, তবু ভালো লাগত, তবু চায়ে চুমুক দেওয়ার কথা মনে থাকত না। মানে—মনে বেশ থাকত, কিন্তু চুমুক আমরা ইচ্ছা করেই দিতাম না। এইটুকু ভান করতে আমরা ভালোবাসতাম। রুপালি চায়ের কাপ থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া উঠত ওপরের দিকে। আমরা চেয়ে চেয়ে দেখতাম, কিন্তু ছুঁতাম না; অপচয়ের আনন্দ, আভিজাত্যের আনন্দ। কিন্তু একটু একটু ক'রে চা জুড়িয়ে যেত, আমরা জুড়িয়ে যেতাম।' হঠাৎ চায়ের কথা মনে হওয়ায় চায়ে একটা চুমুক দিয়ে নিল শুক্লা, বলল, 'যাঃ এও তো দেখছি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।'

কিন্তু অমন শক্ত চেহারা নিয়েও অমলেন্দু ক্রমে ক্রমে নরম চিঠি লেখা শুরু করল। প্রথম প্রথম ও লিখত, শুক্লাদি। কিন্তু কিছুদিন পরে সম্বোধনটা ও তুলে দিল, আমি মনে মনে হাসলাম। কিন্তু কিছুদিন বেশ লাগল এই সম্বোধনহীন চিঠি। এত বেশি নাম, আর এত বেশি সম্বোধন এর আগে পেয়েছি যে, এখন অনামিকা থাকাটাই নতুনত্ব মনে হোলো। কিন্তু কিছুদিন পরেই আমি লিখলাম, এমন সম্বোধনহীন চিঠি লিখলে সম্বন্ধ কি ক'রে গড়ে উঠবে? চিঠিটা পোস্ট করার পরমুহূর্তেই অবশ্য মনে মনে অনুতপ্ত হলাম। এত সহজে ধরা দিতে গেলাম কেন? ও তার জবাবে লিখল, জায়গাটা সাদা থাকলেই তোমার নাম লেখা হোলো বলে মনে হয়। অমন শুভ্র নামের ওপর কথনো রঙ বুলাতে কি ভালো লাগে?

অমলেন্দুও তা হলে ধরা দিচ্ছে!

ক'লকাতায় আমার দূর সম্পর্কের এক দাদু আছে। বাবার কি রকম মামা হন তিনি। আমি মাঝে মাঝে তাঁর বাড়িতেই গিয়ে উঠতুম। বয়সে বুড়ো হলেও আধুনিকদের সঙ্গে তিনি বেশ পাল্লা দিচ্ছিলেন সব

বিষয়ে—বেশেবাসে ভাষায়। আমার সঙ্গে তিনি সর্বদা ফ্লার্ট করতে ভালোবাসতেন। অমলেন্দুর যাতায়াতে তাঁর কোনো আপত্তি ছিল না, বরং প্রশ্রয় দিয়েই তিনি যেন আনন্দ পেতেন।

একদিন আয়নার সামনে বসে বেনী বাঁধছি, অমলেন্দু হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হোলো ; উচ্ছ্বসিতভাবে বলল, মেয়েদের প্রসাধিত রূপের চেয়ে তাদের প্রসাধনের রূপ আরো চমৎকার। শুক্লা, এমন সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে আজ।

হঠাৎ অনেকদিন আগের কথা আমার মনে পড়ে গেল, হেসে উঠলাম, এই, অত কবিত্ব কোরো না, সব অঙ্গের প্রসাধন সম্বন্ধে বোধ হয় সে কথা বলা চলে না।

অমলেন্দু হঠাৎ যেন আহত হয়ে পিছিয়ে গেল, বলল, ঠিক বলেছ, ভুল হয়ে যাচ্ছিল, রক্ষা করেছ তুমি। কবিত্ব তো আমাদের করবার কথা নয়।

কিন্তু কেন সে আমার কথা মেনে নিতে গেল ? কবিত্বের রূপ কি একরকম ? কেন সে নতুন করে লিখলে না কবিতা, আঁকলে না নতুন ছবি ? শুধু আমার নিষেধ ? না আরো নানা নিষেধ ছিল তার,—নানা রকমের হিসাব।

তবু দেখাশুনা চলতে লাগল, চলতে লাগল সতর্কভাবে কবিত্ব বাদ দিয়ে। বয়স বাড়তে লাগল, বছরের পর বছর। ও আমার পূর্বের অভিজ্ঞতা ইঙ্গিতে জেনে ফেলল, আমিই ইচ্ছা ক'রে ওকে জানালাম। মিথ্যা মোহ নয়, ছলনা নয়, যা গড়ে ওঠে তা কঠিন সত্যের ওপর গড়ে উঠুক।

একদিন দেখলুম ওর চোখের কোণে ক্লান্তি জমে উঠেছে। বললুম, আর কেন, বিয়ে করে ফেল অমলেন্দু।

অমলেন্দু বলল, কি সাংঘাতিক মেয়ে। এই যদি মনে ছিল, আগে কেন বললে না? কত ভালোভালো দিন গেল পঞ্জিকায়।

উপহাসটা হজম ক'রে বললুম, কি সাহস তোমার এমন কথা মুখে আনতে পারলে? বয়সে দু'বছরের বড় কিন্তু জাতে দু'ধাপ ছোট, কায়স্থের মেয়েকে বিয়ে করবার দিনক্ষণ সারা পঞ্জিকায় কোথাও পাবে না, আমি বলছি, নোলকপরা ছোটখাট কোনো একটি ব্রাহ্মণকুমারীকে গ্রহণ কর।

অমলেন্দু বলল, মাস্টারী করবার মহৎ দোষই হোলো এই যে, স্কুলের বাইরেও সব জায়গাকে নিজের স্কুল আর সব লোককে ছাত্র বলে মনে হয়। উপদেশের প্রবৃত্তিকে রোধ করা যায় না।

তারপর আরো দিন কাটতে লাগল, দিনের পর দিন আমরা শুকিয়ে উঠতে লাগলাম, ঠাণ্ডাহয়ে যেতে লাগলাম। আর এই শুকিয়ে ওঠাতেই, ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়াতেই যেন বড় কৃতিত্ব, আমাদের বড় প্রতিযোগিতা। কিন্তু অমলেন্দুকে যখন প্রথম দেখেছিলাম, ভেবেছিলাম ওর মধ্যে আমি নতুন হয়ে উঠব, ওর মুগ্ধ দৃষ্টিতে গ্রহণ করব নবজন্ম। কিন্তু আমি ওকে অজ্ঞাতসারে টেনে নিয়ে এলাম আমার সমান ধাপে, শুষ্কতার মরুভূমিতে, ঠাণ্ডা বরফাচ্ছন্ন মেরুদেশে। জিত আমারই, জোর আমারই বেশি। কি বল? মাংসল, পেশীবহুল দেহই আছে অমলেন্দুর, মনের দিক থেকে প্রশান্তের মতই সে দুর্বল।'

শুক্লা থামল।

মাঠভরা কালো জল সন্ধ্যার ছায়ায় আরো কালো হয়ে উঠেছে।

পুনরুক্তি

শুধু চেহারাতেই নয়, কথায়বার্তায় চালচলনেও ত্রিলোকেশবাবুর বয়সের ছাপ এত কম পড়েছে যে, মাস কয়েক একসঙ্গে থাকার পর একদিন তিনি যখন প্রসঙ্গক্রমে বললেন তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ, আমি বিস্মিত না হয়ে পারিনি। অথচ এই কমবয়সী কলপটা তিনি যে ইচ্ছা ক'রে পরেছেন তাও নয়, তা যেন নিতান্ত সহজভাবে তাঁর দেহ আর মনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, শারীরিক দিক থেকে যেমন তাঁকে কোনো ছুটোছুটি খেলাধুলোর সাহায্য নিতে হয়নি, তেমন আলাপ আলোচনায় কি প্রসঙ্গনির্বাচনেও যুব-সুলভতার পরিচয় দেওয়ার জন্যে তাঁর আগ্রহ দেখিনি।

প্রায় তাঁরই সমবয়সী আমার এক আত্মীয়ের অযাচিত অভিভাবকতায় আমি একবার ক্ষুব্ধ হয়ে ত্রিলোকেশবাবুর সঙ্গে তা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তিনি আমাকে অবাক ক'রে দিয়ে বললেন, 'ওটা বয়সের ধর্ম।'

বললুম, 'বয়স আপনিও মানেন নাকি?'

তিনি হেসে বললেন, 'না মানব কেন?'

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'তাকে মানতে হয়না, সে আপনিই মানিয়ে নেয়। বয়স্ক লোকদের যে তারুণ্যের পরিচয় পান একটু ভাল ক'রে যদি লক্ষ্য ক'রে দেখতে শেখেন তাহলে তার গিল্টি করা রূপ ধরে ফেলতে দেরি হবে না। আসলে নকলে বড় মারাত্মক ভেদ, নিখিলবাবু।

ত্রিলোকেশবাবু চুরুট ধরাতে ধরাতে ম্লান একটু হাসলেন।

এতকাল একসঙ্গে আছি, একই ঘরে পাশাপাশি সিটে রাত জেগে কতদিন কত আলাপ আলোচনা করেছি, কিন্তু তার মধ্যেও যে এমন একটি ক্লান্ত বিক্ষুব্ধ মন লুকিয়ে ছিল তা এতদিন লক্ষ্য করিনি। আমি চুপ ক'রে রইলাম।

খোলা ছাতেও রাত্রির অন্ধকার এত ঘন হয়ে এসেছে যে, আমরা কেউ আর কারো মুখ দেখতে পারছি না।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ত্রিলোকেশবাবু খানিকটা আত্মগতভাবেই বললেন, 'আমার মুখে এ-সব কথা শুনে আপনি হয় তো বিস্মিত হচ্ছেন, কিন্তু আমি নিজেই কি সেদিন কম বিস্মিত হয়েছিলাম।'

তারপর হঠাৎ তিনি বললেন, 'চলুন উঠি, এবার ঘুমোবার চেষ্টা দেখা যাক। গরমটা অনেক কমেছে।'

বললাম, 'আরো কিছুক্ষণ বসা যাক না ত্রিলোকেশবাবু।'

ত্রিলোকেশবাবু হাসলেন, 'ও, আপনি বুঝি গল্পের গন্ধ পেয়েছেন।'

আমিও হাসলুম, 'তা একটু পাচ্ছি বই কি। আর আপনার উদার দাক্ষিণ্যের ওপর আমার বিশ্বাস আছে।'

'বটে? তাহলে তো সে বিশ্বাস আর বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখতেই হয়। চুপ ক'রে থেকে ত্রিলোকেশবাবু কি ভাবলেন, তারপর বললেন, 'আচ্ছা, ধরুন এক ভদ্রলোক, বয়স—তা এই আমার মতই—নাম—পাত্রপাত্রীর নামগুলি আপনাকে জোগাতে হবে, নিখিলবাবু, নাম সহসা আমার মাথায় আসে না।'

'আচ্ছা, সেজন্যে ভাবনা নেই, তবে আপাতত একটা নামের ব্যবহার আমরা বাঁচাতে পারি আপনি যদি উত্তম পুরুষে গল্পটা আরম্ভ করেন।

কথা দিচ্ছি সেটাকে টেকনিক হিসাবেই নেব, আপনার নিখুঁত আত্মজীবনী বলে বিশ্বাস করব না।'

আবহাওয়াটা হাল্কা ক'রে দেওয়ায় ত্রিলোকেশবাবু যেন খুশিই হলেন। তরলকণ্ঠে বললেন, 'করবেন না তো? খুব আশ্বস্ত হলাম। আচ্ছা, শুনুন।

জানেন বোধ হয়, এই ইনসিওরেন্সের অফিসে চাকরী নেওয়ার আগে আমি সেদিন পর্যন্ত আমাদের গাঁয়ের স্কুলে মাষ্টারী করতাম! এক হিসাবে এই শহর থেকে নিরুপায় হয়েই গাঁয়ে আমাকে পালাতে হয়েছিল। ইদানীং এই যুদ্ধের আমলের মত না হোক আমরা যখন পাশটাশ ক'রে বেরুই তখন চাকরী কলকাতায় মোটামুটি সুলভই ছিল, তবু যে আমি কিছু সুবিধা করতে পারিনি তার কারণ আমার বড়লোক পদস্থ আত্মীয়দের ধারণা অহংকারী, অপরিণামদর্শী, আর আমার দু'চারজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মনোভাব আমি ভীরু, দুর্বল, মুখচোরা। খবরের কাগজের কর্মখালির বিজ্ঞাপন থেকে ঠিকানা টুকে রাখতাম। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। দরখাস্ত লিখতে আমার গায়ে জ্বর আসত। মনে মনে বহু রিহার্সাল দেওয়ার পর দু'চারজন সাহেবসুবোর সঙ্গে একেক দিন দেখা করতে যেতাম, কিন্তু আলোচনার পর দ্বিতীয়দিন আর ওমুখো হতাম না। চাকরী সংগ্রহের পক্ষে একদিন দেখা করাটা মোটেই যে পর্যন্ত নয় সে সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এতদিনে হয় তো আপনার হয়েছে।

যা হোক, সমস্ত উচ্চাকাঙ্খা ছেড়ে গাঁয়ের স্কুলে মাষ্টারী আর পুত্রকলত্র পরিবৃত হয়ে নির্বিবাদে গার্হস্থ্যজীবন যাপন করছিলাম, এমন সময় এলো দুর্ভিক্ষ। জেলে আর নমশূদ্রদের স্কুল! প্রথম ধাক্কাতেই স্কুল গেল উঠে। তাহলেও ঘরে সংবৎসরের খোরাক আছে, তাই সাধারণ

লঙ্গরখানার সম্পাদক হলাম। স্কুলের চেয়ার ছেড়ে বাড়ির ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিলাম বিশ্রামের আশায়।

কিন্তু স্ত্রী ছাড়লেন না, স্কুল উঠেছে অথচ আমার ওঠার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছেনা, তিনি ভয়ংকর বিপদ গণলেন।

চিরটা কালই কি এরকম যাবে? এতখানি চরম হোলো অথচ—

বললুম, আমিও তো তাই ভাবছি, এতখানি বয়স নিয়ে নতুন ক'রে কিই বা আর করতে পারি? স্ত্রী ভ্রূ কুঁচকে বললেন, বাজে কথা রাখো, কিছুরই বাড়াবাড়ি ভালো নয়। কি এমন বয়সটা হয়েছে যে চাকরীর চেষ্টায় বেরুতে পারবে না। এ বয়সে আমার ছোড়দা এখনও বিয়ে পর্যন্ত করেননি জানো?

হেসে বললুম, বয়সটা যে মুহূর্তে মুহূর্তে তোমার সুবিধামত ওঠে নামে তা জানতাম না।

কিন্তু বেরুতেই হোলো। সত্যি বসে থাকলে চলবে কি ক'রে বিঘা কয়েক ধানী জমি থেকে নিতান্ত না হয় খোরাকটাই হয় বছরের, সংসারে আরো তো অনেক কিছুর দরকার।

চলে এলুম ক'লকাতায়। দেখা গেল আগে যা পারতাম না, এখন তা বেশ পারি। দু'তিনটি পদস্থ বন্ধুর সঙ্গে একাধিক দিন দেখা করলাম এবং তাদের একজনের অফিসে এবং অধীনে চাকরীও নিয়ে ফেললাম। তিনি এখানকার একটা নামকরা ইনসিওরেন্স অফিসের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। সুতরাং আপনাকে একটা নাম সরবরাহ করতে হবে নিখিলবাবু।'

ত্রিলোকেশবাবু যে কোন অফিসে কাজ করেন তা জানি এবং তার ম্যানেজিং ডাইরেক্টরও আমার অচেনা নয়, তাই ত্রিলোকেশবাবুর এই লুকোচুরি ভারি ছেলেমানুষি মনে হোলো। তবু তাঁর সঙ্গে খেলায় যোগ দিয়ে বললুম, 'ধরা যাক তাঁর নাম নগেনবাবু।'

'নগেনবাবু? আচ্ছা বেশ। নগেনবাবু প্রায় আমার সমবয়সী হলেও ধনে পদমর্যাদায় অনেক উর্ধ্বে। অন্য সকলের সামনে তাঁকে নগেনবাবুই বলতে হয় এবং তাঁর সামনে ও তাঁর নাম ধরবার প্রয়োজন হয় না।

সেদিন কাজের চাপ ছিল বেশি। অথচ সাড়ে পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে এ্যাসিসট্যান্টটি এমন মুখ কাঁচুমাচু ক'রে ছুটি চাইল যে, না দিয়ে পারলাম না। ঘাড় নিচু ক'রে কি একটা ফাইল দেখছিলাম, কাঁধে চাপড় পড়তে চমকে মুখ তুলে তাকালাম। দেখি নগেনবাবু সামনে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন, বললেন, আমার ধারণা ছিল দীর্ঘকাল মাস্টারী করলে লোকে বোকা হয়ে যায় কিন্তু তুমি এত সেয়ানা হলে কি ক'রে?

অবাক হয়ে বললুম, চালাকির কি দেখলে।

এমন ক'রে কাজ দেখাতে আমিও পারতুম না।

কাজ দেখানো! মুখটা হয়ত আরক্ত হয়ে উঠে থাকবে, নগেনবাবু হাত ধরে আমাকে চেয়ার থেকে টেনে তুললেন, তাছাড়া আবার কি? আচ্ছা তোমার হিউমার বোধটা কি জীবনেও আসবে না? হয়েছে, এবার ওঠো, চল আমার সঙ্গে।

কোথায়?

যোগলক্ষ্মী দেবীর ওখানে।

হঠাৎ ত্রিলোকেশবাবু স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বুঝতে পারলাম অসতর্ক মুহূর্তে নামটা তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু কিছুই যেন হয়নি এমনি সপ্রতিভভাবেই ত্রিলোকেশবাবু আবার বলতে আরম্ভ করলেন।

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, যোগলক্ষ্মী দেবীর ওখানে?

হ্যাঁ, তাঁর হুকুম। এখানে এসেছ অথচ দেখা করনি, এতে তিনি ভারি

দুঃখিত হয়েছেন। তোমারও খুব অন্যায় হয়ে গেছে যাই বল। বিশেষ ক'রে ওঁরা তো তোমার কি রকম আত্মীয়ও শুনেছি।

যোগলক্ষ্মী। খবরের কাগজে এখনো তাঁর নাম মাঝে মাঝে দেখতে পাই। এখনও তিনি দু'একটা শিল্প প্রদর্শনী আর অনাথ আশ্রমের উদ্বোধন করেন, ভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের স্মৃতি-বার্ষিকীতে উপস্থিত থাকেন, দু'একটা সাহিত্য সভায়ও কি কি বক্তৃতা করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ কাগজে পড়েছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য, আমি তাঁকে কি অদ্ভুত ভাবেই না ভুলে যেতে পেরেছি যে, তাঁর নাম কাগজে পড়লেও সেই সঙ্গে অতীতের কোনো কাহিনী আর আমার মনে পড়ে না। কিন্তু নগেনের মুখে তার নাম উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির সেই রুদ্ধ দুয়ার হঠাৎ যেন আমার খুলে গেল।

বললুম, থাক না আজ, আর একদিন যাওয়া যাবে।

আর একদিন কেন আবার, গরজটা শুধু তাঁর নয়, আমাদেরও। নতুন একটা ফায়ার ইনসিওরেন্স খোলার কথা চলেছে। যোগলক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে সেই আলোচনাও হবে। সেদিনও তিনি বেশ মোটা রকমের শেয়ার কিনতেই রাজি ছিলেন, আবার যে কেন পিছুচ্ছেন বুঝতে পারছি না। চলো যে ভাবেই হোক তাঁকে সম্মত করাতেই হবে। এতটা এগিয়ে আর পিছোন যাবে না, এসো।

তখন বাড়ি ছিল শ্যামবাজারে। সেই পুরোনো বাড়ি ভাড়া দিয়ে বালিগঞ্জে আধুনিক প্রথায় এক নতুন বাড়ি করেছেন যোগলক্ষ্মী। সেই প্রাচীন পরিবেশ কিছু নেই। গেটের কাছে একখানা চেনা মুখও চোখে পড়ল না। তবু আগেকার কথা মনে ওঠায় এতকাল পরে বুকের মধ্যে আজও যেন একটু কম্পন অনুভব করলাম।

বসবার ঘরে এসে দেখলাম সেই পুরোনো আসবাবের সবই যোগলক্ষ্মী

ফেলে আসেননি। দেওয়ালের চারিদিক ঘিরে দেশী বিদেশী রাজনীতিক আর শিল্পী সাহিত্যিকদের ছবি। সোফা কৌচের সঙ্গে ঘরের অর্ধেকটা জুড়ে তক্তাপোশের উপর সেই বিস্তীর্ণ ফরাশটাও আছে, কেবল নেই সেদিনের ভিড়। যোগলক্ষ্মী দেবীর বৈঠকখানা যে এত জনবিরল কোনোদিন হতে পারে তা কি কখনও ধারণায় আনা যেত?

চাকর এসে পান সিগারেট পরিবেশন করল এবং জানাল কর্তামা ঠাকুর-ঘরে ঢুকেছেন আর কেউ এলে অপেক্ষা করতে বলেছেন।

নগেন ঠোঁট চেপে বললেন, তবেই হয়েছে, তোমার জন্যেই যত দেরি হোলো। এখন ঠাকুর ঘর থেকে কখন বেরোবেন তার ঠিক কি?

ঠাকুর ঘর! আগেও অবশ্য যোগলক্ষ্মী ঈশ্বর বিশ্বাস করতেন। কিন্তু আচার অনুষ্ঠানে সেই বিশ্বাসকে দিনযাত্রায় এমন ক'রে চিহ্নিত ক'রে রাখতেন না। রাজনীতি ছাড়া অন্য কোনোদিকে মন দেওয়ার তাঁর কিছুমাত্র সময় ছিল না। এখন সেই কর্মবহুল, ঘটনাবহুল জীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর খানিকটা সময় ঠাকুর দেবতা দিয়ে যদি ভরে তোলবার তার প্রয়োজন হয়ে থাকে বিস্মিত হবার কি আছে?

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে কিছুদূর থেকে তাঁর কথা শোনা গেল। ওদের চা-টা দেওয়া হয়েছে? কেবল পান আর সিগারেট? বুদ্ধি ক'রে চায়ের কথা বলতে পারলিনে? মেয়েটা বুঝি এখনো ফেরেনি, তার সভা সমিতি কি রাত বারটা অবধি চলবে? এদিকে তাঁর পায়ের শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের শব্দও শুনতে পাচ্ছি। যোগলক্ষ্মী আসছেন।

একটু পরেই তিনি এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। কিন্তু এই কি যোগলক্ষ্মী? সেই পূজোর ঘরের পোশাকেই চলে এসেছেন। খাটো গরদের থান পরেন, কপালে তিলকসেবার চিহ্ন পরিস্ফুট। আগেও অবশ্য

একটু পুষ্টাঙ্গীই ছিলেন যোগলক্ষ্মী। কিন্তু এখনকার চেহারার সঙ্গে তার তুলনাই চলে না। মেদমাংসের বাহুল্য গরদের থাটো থানে কিছুতেই বাধা পড়তে চাইছে না। আর কোথায় সেই চুল? সমস্ত মাথাটা সেকেলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মত ছোট ক'রে ছাঁটা। মাথার থাটো আঁচলের বাইরে সামনের দিকের চুলগুলি অধিকাংশই প্রায় সাদা হয়ে এসেছে। আর দু'পাশ দিয়ে কেশহীন স্থূল অনাবৃত ঘাড়ের খানিকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মনে পড়ল সমস্ত পিঠ ছেয়ে রহস্যঘন কি চুলই ছিল যোগলক্ষ্মীর। বিধবা হওয়ার পরও দীর্ঘকাল ধরে চুলের তিনি যত্ন নিয়েছেন। শুনেছিলাম একবার তাঁর এক বিধবা ননদ এই নিয়ে তাঁকে শ্লেষ করেছিলেন, দেশের কাজের জন্যে থিয়েটারওয়ালীদের মত চুল রাখাও দরকার হয় নাকি বউ? যোগলক্ষ্মী জবাব দিয়েছিলেন, হয় বৈকি দিদি, দশজনের সামনে আমাকে বেরুতে হয় বলেই তাদের চোখ দুটোর কথাও আমাকে ভাবতে হয়।

আজ ছোট ক'রে ছাঁটা যোগলক্ষ্মীর এই কাঁচাপাকা চুলগুলি দেখে হঠাৎ আমার এক অদ্ভুত কথা মনে হোলো। রাজনীতি ছেড়েছেন বলেই কি যোগলক্ষ্মী এমন ক'রে চুল ফেলে দিলেন, না কাঁচাপাকা চুলগুলির মায়া তাঁকে বাধ্য হয়ে ত্যাগ করতে হোলো বলেই তিনি রাজনীতি ছাড়লেন। মুহূর্তকাল বোধহয় স্তব্ধ হয়ে ছিলাম। তারপর জীবনে সেই সর্বপ্রথম নির্ভয় নিঃসংকোচে তাঁর চোখের দিকে চেয়ে স্পষ্টকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছেন?

যোগলক্ষ্মী স্নিগ্ধ হাসলেন, ভালো। আমাকে কি কোনদিন খারাপ থাকতে দেখেছ? তারপর নগেনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, অনেকক্ষণ ধরে আপনাদের বসিয়ে রেখেছি বোধ হয়। নগেনবাবু বললেন, না না তাতে আর কি হয়েছে সে জন্যে ভাববেন না।

যোগলক্ষ্মী আবার একটু হাসলেন, আর এখন ভেবেই বা কি করতে পারি বলুন? আপনাদের দেরি দেখে ভাবলুম এই ফাঁকে সন্ধ্যাটা সেরে ফেলি।

নগেনবাবু বললেন, তা বেশ করেছেন, কিন্তু তাড়াতাড়িতে দেবতার অংশে কিছু কম পড়ে না থাকে তাই ভাবছি।

যোগলক্ষ্মীর ঠোঁঠের উপর দিয়ে হাসির ঝিলিক খেলে গেল, তাই নাকি? নাস্তিক হলেও দেবতার উপর তো আপনাদের এখনও ভারি মমতা আছে দেখ্‌ছি। কিন্তু আমার তো ধারণা অংশের হ্রাসবৃদ্ধি নিয়ে তাঁর বেশি দুশ্চিন্তা নেই, যতটা আপনাদের।—দাঁড়ান, প্রসাদের থালা তো ঘরেই ফেলে এসেছি, নিয়ে আসি। ত্রিলোকেশ, তোঁমার কি খবর আজকাল। ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস করো, না তেমনি নাস্তিকই রয়ে গেছ?

আমার হয়ে নগেনবাবু জবাব দিলেন, সে যাই থাক, তাতে আটকাবে না। আজকালকার নাস্তিকেরা অত বোকা নয়, ঠাকুর দেবতাতেই তাদের আপত্তি, প্রসাদে কোনো আপত্তি নেই। কি বল হে ত্রিলোকেশ?

যোগলক্ষ্মী বেরিয়ে গেলেন এবং একটু পরেই শ্বেত পাথরের ছোট্ট একখানা রেকাবি হাতে ফিরে এলেন। দু'টি সন্দেশ তুলে প্রথমত নগেনবাবুর হাতে দিলেন, তারপর আমার ঈষৎ প্রসারিত হাতের তালু আঙুলে ছুঁয়ে দু'টি সন্দেশ আমার হাতে রাখলেন, বললেন, খেয়ে দেখ, ভীম নাগের চেয়ে নিতান্ত ফেলনা যাবে না বোধ হয়।

নগেনবাবু টীকা ক'রে বললেন, ওঁর নিজের হাতে তৈরি।

কোনো একটা ঘটনার পর সেকালে যোগলক্ষ্মী আমার হাত ছুঁয়ে এমন ক'রে কিছু দিতেন না, আজ এতকাল পরে দেখলাম আমি আবার স্পৃষ্ট হয়েছি, কিন্তু কোথায় সেই স্পর্শানুভূতির তীব্রতা? আঙুলগুলি

অত মোটা বলেই কি সেগুলি আমার চর্মের বহিরাবরণে এসে থেমে রইল, তাদের স্পর্শে রক্তের সমুদ্র দুলে উঠল না?

সন্দেশটা মুখে তুলতে যাব একটু দূরে কার লঘু পায়ের শব্দ শোনা গেল আর আমাদের দোড়গোড়ায় এসে হঠাৎ সেই শব্দ থেমে পড়ল। সন্দেশ সুদ্ধু হাতটা লুকিয়ে সামনের দিকে তাকালাম। আঠার উনিশ বছরের একটি তন্বী সুন্দরী মেয়ে। তার চোখ এবং ঠোঁটের কোণ থেকে কৌতুকের বাঁকা হাসি তখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায়নি।

যোগলক্ষ্মী ততক্ষণে পিছনে ফিরেছেন, দস্যি মেয়ে, রাত এই নটার সময়—এতক্ষণে বুঝি তোমার সভা ভাঙলো?

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, চিন্‌তে পারছো তো? আমার কনিষ্ঠা নন্দিনী দিল্লী।

বললুম, চেনা একটু কঠিনই। খুব ছেলেবেলায় তো দেখেছি।

দিল্লীর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে যোগলক্ষ্মী আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। সে হাসিতে বাৎসল্যের স্নিগ্ধতা।

বললেন, বলো কি, তুমিও আবার এসব কি মিথ্যাসাক্ষী দেওয়া আরম্ভ করলে? ও আবার কোনোদিন ছোট ছিল নাকি? ওর তো ধারণা ও এত বড় হয়েই জন্মেছে, ওকে কি কারো নাইয়ে খাইয়ে দিতে হয়েছে, না কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করতে হয়েছে?

যোগলক্ষ্মীর হাসির 'সঙ্গে হাসি মিলিয়ে দিল্লীর দিকে সস্নেহ কৌতুকে তাকালাম, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই আমার ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে গেল; নিজের শৈশবকে ও যদি ভুলে গিয়ে থাকে সে কি এতই অস্বাভাবিক? ওর দিকে তাকালে অন্য কারোই কি ওর ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে?

যোগলক্ষ্মী বললেন, আয় ঘরে আয়, এঁকে চিনতে পারছিস্? তোর মামীমার মেজদা, ডিঙামানিকের ত্রিলোকেশ চৌধুরী।

দিল্লী ছোট্ট নমস্কার জানিয়ে মৃদু হেসে বলল, ও, আপনার গল্প ছোটবেলায় অনেক শুনেছি, অনেক পড়েছি।

তারপর হঠাৎ নগেনবাবুর দিকে ফিরে বলল, এই যে নগেনবাবু, অনেকক্ষণ এসেছেন বুঝি। তারপর চিন্ময়ের খবর কি বলুন তো, ও যে কলেজেও আসছে না, এসোসিয়েশন অফিসে রিহার্সেলেও আসছে না, কি হোলো হঠাৎ ওর?

চিন্ময় নগেনবাবুর বড় ছেলে, ইংরেজী সাহিত্যে এম, এ পড়ছে দিল্লীর সঙ্গে। নগেনবাবু সলজ্জ হেসে জবাব দিলেন, সে বোধ হয় তোমরাই ভালো জান।

দিল্লী বলল, তা একটু একটু জানি। দয়া ক'রে কালই একবার ওকে পাঠিয়ে দেবেন তো, এমন ছেলেমানুষ।

হঠাৎ চমকে উঠলাম, কথাটা আরো যেন কোথায় শুনেছি। যোগলক্ষ্মীর খ্যাতি আর প্রতিপত্তির সঙ্গে উত্তরাধিকার সূত্রে এই অল্প বয়সে দিল্লী কি তার মায়ের সেই বৈশিষ্টকেও আয়ত্ত ক'রে ফেলেছে? সেই পুরুষ-মানুষকে ছেলেমানুষ বলতে পারার বাহাদুরি?

তরতর ক'রে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে দিল্লী আর একবার মুখ বাড়িয়ে বললে, ওকে আসতে বলবেন, আর বলে দেবেন হিরোর পার্ট ওকেই দেওয়া হবে।

তরল মিষ্টি একটু হাসির শব্দ শোনা গেল।

মেয়ের এমন প্রগল্‌ভতায় জানি না যোগলক্ষ্মীও লজ্জাবোধ করলেন কিনা। আমার দিকে তাকিয়ে অপ্রতিভভাবে একটু হেসে বললেন, বোসো চায়ের ব্যবস্থা ক'রে আসি।

বললুম, চায়ের জন্যে অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আর তার জন্যে আপনার যাওয়ার কি দরকার?

আর কে আবার যাবে, ঐ মেয়ে করবে চা? ওর বাথরুম থেকে বেরুতে বেরুতেই রাত দশটা, আমিই পারব! এক কাপ চা ক'রে আনতে পারব না এমনই কি অথর্ব হয়ে গেছি ভেবেছ?

চা এল। যোগলক্ষ্মী খুঁটে খুঁটে আমার পারিবারিক অনেক সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। কেমন আছে কল্যাণী? কেমন আছে ছেলেমেয়েরা? বড় ছেলের বয়স কত হোলো? বললুম, বছর তেরচোদ্দ হোলো বোধ হয়। যোগলক্ষ্মী বললেন, বোধ হয়! এখনও তেমনি আছ, সংসারে কিছুরই সঠিক খবর রাখো না, ভাই বোনে কটি হোলো ওরা?

এবার সুনিশ্চিত জবাব না দিয়ে উপায় রইল না।

একটু চুপ ক'রে থেকে যোগলক্ষ্মী বললেন, আমি সব শুনেছি নগেনবাবুর কাছে, সেই বুড়ো বয়সে ক'লকাতায় তো এলেই শেষ পর্যন্ত, কিন্তু সময় থাকতে এলে না। ওই সব মাস্টারি টাস্টারিতে কি আর চলে?

যাওয়ার সময় যোগলক্ষ্মী দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বললেন, এসো কিন্তু আর একদিন। তারপর নগেনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, আচ্ছা আমার আগের কথাই ঠিক রইল নগেনবাবু, দেবতাকে যা মানত করি অবস্থা ভেদে তার বরং হ্রাসবৃদ্ধি চলে। কিন্তু আপনাদের বেলায় তো আর তার জো নেই, একটু কম হলেই আপনারা জোর চালান। কিন্তু সকলের সাধ্য কি সমান? গরীব বিধবার টাকাগুলো তো জলে যাবে না নগেনবাবু?

না না, কি যে বলেন, আপনার মুখে ও কথা মানায় না, দেখছেন তো বাজার? দ্বিগুণ চতুর্গুণ হয়ে ফিরে আসবে।

একটু থেমে হঠাৎ ত্রিলোকেশবাবু বললেন, চলুন এবার বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, এখন হয় তো ঘুম আসবে।

আমি হেসে বললাম, কাহিনী শেষ না হলে শুধু কি আমরই ঘুম আসবে না ভেবেছেন ?

ত্রিলোকেশবাবু তবুও চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপ ক'রে রইলেন। এতক্ষণে সত্যিই ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর মনে হোলো ত্রিলোকেশবাবু সত্যিই আজ আর কিছু বলবেন না। উঠব কিনা ভাবছি ত্রিলোকেশবাবু বললেন, আচ্ছা শুনুন। বাকিটা না শুনলে আপনি যখন নিজে নিজে না বানিয়ে ছাড়বেন না তখন আপনাকে বলাই ভালো।

হিরো হতে চিন্ময়ের কিছু দেরি লেগেছিল। অবশ্য তার কৃতিত্ব এবং দায়িত্ব কেবল আমারই নয়, দিল্লীর স্বভাবেরও। আগেই বলেছি জিনিষটা তার মার কাছ থেকে পাওয়া। মতের দিক থেকে যোগলক্ষ্মীর সঙ্গে ইদানীং দিল্লীর কোনো কিছুরই মিল ছিল না, না রাজনীতিতে, না ধর্মমতে, না সাহিত্যবিচারে। কিন্তু স্বভাবে যেন কোথায় খানিকটা সাদৃশ্য ছিল। এমন কি আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যোগলক্ষ্মী এ যুগে জন্মালে ঠিক দিল্লীর মতই হতেন, তাঁর নীতিজ্ঞান এবং রাজনীতি হয় তো এমনি রূপান্তর গ্রহণ করত। সহকর্মী এবং সমবয়সী ছেলেদের সম্বন্ধে দিল্লীর মনোভাবটা ঠিক সেকালের যোগলক্ষ্মীর সঙ্গে তুলনা করা চলে। দিল্লীর কাছেই শুনেছি ছেলেবেলা থেকে তার মা তাকে সাধারণত নিজের এবং নিজের প্রবীণ বন্ধুদের সাহচর্যে রেখেছেন। তাদের আলাপ আলোচনা চালচলনেই দিল্লী অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। ম্যাট্রিক পাশ করার পর থেকে যোগলক্ষ্মী অবশ্য আর মেয়েকে নিজের গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে রাখতে পারেননি। ভিন্ন মত, ভিন্ন রুচি এবং বিভিন্ন রকমের বন্ধু সে সংগ্রহ করেছে। আমার যতটা বিশ্বাস কৈশোরেই প্রেম সম্বন্ধে তার কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছিল যাতে কোনো বন্ধুর সানুরাগ মনোভাব

তার কাছে পরিহাসের বস্তু হয়ে উঠেছিল। বিদ্যা বুদ্ধি থাকা সত্বেও সমবয়সীরা তার কাছে সবাই ছেলেমানুষ, যেন নিতান্তই কৌতুকের পাত্র।

প্রথম প্রথম আমিও দিল্লীর কাছে কৌতুকের বিষয়ই ছিলাম। যেন প্রাগৈতিহাসিক কিম্ভুতকিমাকার কোনো জন্তু এবং তার জন্যেই জীব-তাত্ত্বিকদের কাছে নিতান্ত মূল্যবান। তার বহু বন্ধুর সঙ্গে আমাকে সে এই ভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, ইনি সেই ত্রিলোকেশ চৌধুরী। এক সময় আনক্যানি গল্প লিখে খুব নাম করেছিলেন।

তবু আমাকে দিল্লীর যদি ভালো লেগে থাকে সে কেবল আমার সঙ্গে তর্ক করবার জন্যে। আর লেখা ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে আমারও তর্ক করবার শক্তি না হোক আসক্তি বেড়েই গিয়েছিল। বিতর্কটা প্রায়ই হোতো সাহিত্য সংক্রান্ত। দিল্লীর বক্তব্য ছিল আমরা, এই ত্রিলোকেশ চৌধুরীরা সাহিত্যে কিছুই করতে পারেনি। কেবল মধ্যবিত্ত যৌনজীবনের বিকৃতি, ছোট ক্ষোভ, ছোট ঈর্ষা—এরই উপর কারিকুরি করেছি। আধুনিক সাহিত্যের নমুনা হিসাবে আমাকে মাঝে মাঝে তার নিজের এবং বন্ধুদের কবিতা গল্প পড়ে শোনাত। কিন্তু আমি যে তেমন রসগ্রহণ করতে পারছি না এটা বুঝতে তার দেরি হোতো না। সঙ্গে সঙ্গে সে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠত, এ আপনার ঈর্ষা, নিজে লেখা ছেড়ে দিয়েছেন বলে কারোর লেখাই আপনার সহ্য হয় না। আপনাকে দিয়ে আবার লেখাতে হবে, তাহলে বুঝবেন লেখা কত কঠিন।

লেখার কাঠিন্য তাহলে তোমরাও মানো।

এই সেরেছে। আপনি এবার নিশ্চয়ই দৈবী ইন্‌স্‌পিরেশনের কথা এনে ফেলবেন।

দৈবী না হোক মানবীয় ইন্‌স্‌পিরেশনে তো আপত্তি নেই।

আছে বৈ কি, কথাটার এসোসিয়েশনই খারাপ। কোনো লেখক যখন বলেন আজকাল আর লিখতে পারছিনে—আমার ভারি হাসি পায় লিখতে না পারাটা কি ক'রে সম্ভব যখন ছেলেবেলার অক্ষর পরিচয়টা আমরা চেষ্টা করেও ভুলতে পারিনে? আমার তো বরং একেক সময় দেখে দারুণ বিস্ময় লাগে যে, যাই কিছু না লিখি তারই কোনো না কোনো মানে হয়ে যায়, কি অদ্ভুত! শুধু অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে গেলেই হোলো। দিল্লীর সেযের কথাগুলির মধ্যে এমন একটা আন্তরিক উল্লাস ছিল যে সহসা কোনো প্রতিবাদ করতে আমার বাধল।

একটু চুপ ক'রে থেকে দিল্লী, বলল, আপনাকে কিন্তু আমাদের কাগজে সামনের মাসে লিখতে হচ্ছে। আমি কথা দিয়েছি।

বললুম, তার চেয়ে তোমাদের লেখার প্রশংসাও বরং আমার পক্ষে সহজ। কথাটা ভুল করেছ। লেখা দিলেই বরং ঈর্ষা, আর অহমিকা ছাড়ে, অন্যের লেখার রসগ্রহণে সুবিধা হয়। কেন না প্রত্যেক লেখকেরই ধারণা একমাত্র তার কাছেই কলালক্ষ্মী ধরা দিয়েছেন।

দিল্লী হাসল, আপনি তাহলে উদার হওয়ার জন্যেই লেখা ছেড়েছেন, যাক্, উদ্দেশ্যটা অন্তত মহৎ।

শুধু উদার নয়, সহজ হওয়ার জন্যেও। কি লাভ বৃহৎ পৃথিবী থেকে নিজেকে বঞ্চিত ক'রে। চারিদিকের লোক চলে ফেরে হাসে কাঁদে, নিজের প্রয়োজনে নিজের আনন্দে তারা বাঁচে। আর কলম নিয়ে আমরা ছুটি তাদের পিছনে পিছনে। কতটুকু আমরা তাদের দেখতে পারি, কতটুকু গ্রহণ করতে পারি, নিতান্ত যতটুকু আমরা লিখতে পারব। আমাদের লেখার ভঙ্গির সাথে দেখার ভঙ্গি এক হয়ে যায়। দিনের পর দিন রাতের পর রাত পৃথিবী রং বদলায় আর আমি কেবল কাগজের ওপর কথা কাটি আর কথা বদলাই।

দিল্লী একদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল, আমি হঠাৎ থেমে যেতে সে চোখ নামিয়ে নিল। তারপর হেসে বলল, নিষ্ফলতার ওপরে এমন ক'রে রং ফলাতে আপনার মত আর কেউ পারবে না।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার মনে হোলো রং কি কেবল জীবনের নিষ্ফলতার ওপরই লেগেছে ?

মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে ও বেড়াতে বেরোত। কদাচিৎ কোনোদিন সিনেমায়ও যেতাম। কখনো কখনো চিন্ময় থাকত, কোনদিন বা যোগলক্ষ্মী, কোনো কোনোদিন আবার কেউই থাকত না। সিনেমা দেখে এসে দিল্লী নিন্দা করত এবং আমার সঙ্গে তার মতের অমিল হোতো না।

এমনি ক'রে আরও কিছুদিন কাটল। দিল্লী মাঝে মাঝে তাদের এসোসিয়েশনে নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে প্রায়ই জোর জবরদস্তি করত কিন্তু সেখানে যাওয়ার কল্পনায় আমি তেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতাম না। দিল্লী বলত, যাচ্ছেন না কেন জানি। আচ্ছা আমার বন্ধুদের সামনে আপনি অত নার্ভাস ফিল্ করেন কেন ? ওদের সামনে আপনার কথার ধারও যেমন কমে, রংও তেমনি ফিকে হয়ে আসে।

তাই নাকি, কিন্তু তাতে তোমার বন্ধুদের বা তোমার কোনো ক্ষোভের কারণ তো দেখি না। জয়ের আনন্দের ভাগ তুমিও তো পাও, না পাও না ?

দিল্লী অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, কেন পাব না ?

তার সমস্ত মুখ যেন আরক্ত হয়ে উঠল।

আর সেই রক্তিম সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে মুহূর্তের জন্যে নিজের অকৃতার্থতার গ্লানিতে আমার সমস্ত অন্তর ভরে গেল।

বোধ হয় মুহূর্তকাল দু'জনেই চুপ ক'রে ছিলাম। যোগলক্ষ্মী ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। এটা যোগলক্ষ্মীর লাইব্রেরী ঘর। তাঁর স্বামী ভুবনবাবুর ছেলেবেলা থেকে বই কেনার ভারি সখ ছিল। বই কিনবার বা পড়বার দিকে যোগলক্ষ্মীর যে বিশেষ ঝোঁক ছিল তা নয়। কিন্তু স্বামীর অনেক সখের মত এ সখটাকেও এমন আত্মগত ক'রে নিয়েছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পরও বহুকাল ধরে তিনি কিছু কিছু বই কিনে এই পারিবারিক লাইব্রেরীটিকে মূল্যবান ক'রে তুলেছেন। চারদিক ঘিরে সারি সারি কাঁচের আলমারি আর তার ভিতরে অসংখ্য বইয়ের স্তূপ ঘরটির মধ্যে স্তব্ধ গাম্ভীর্য্য এনে দিয়েছে।

যোগলক্ষ্মী বলেন, সমস্ত বাড়ির মধ্যে এই ঘরটিতে এসে কি যে শান্তি পাই তা বলতে পারিনে। ইচ্ছা করে দিনের পর দিন এখানে লুকিয়ে থাকি।

কি মন্তব্য করা যায় ভেবে পেলাম না। দিল্লীও দেখলাম চুপ ক'রে রয়েছে। একটু থেমে যোগলক্ষ্মীই আবার কথা বললেন।

আজ আবার কি তর্ক হচ্ছিল তোমাদের?

বললুম, দিল্লী বলছিল ওর বন্ধুদের সঙ্গে আমি নাকি মন খুলে আলাপ করি না।

দিল্লী জোর ক'রে সপ্রতিভ হতে চেষ্টা করল।

যেন ইচ্ছা করলেই উনি করতে পারেন। করেন না মানে, করতে পারেন না। তোমার এই বন্ধুটির মত নার্ভাস লোক আমি আর দুটি দেখিনি মা। কি ক'রে যে তোমাদের বন্ধুত্ব হয়েছিল আমি ভেবে পাইনে। তোমাদের মধ্যে কোনোদিক দিয়েই তো কোনো মিল নেই। আড়চোখে একবার তাঁকিয়ে দেখি যোগলক্ষ্মীর গৌরবর্ণ মাংসল মুখখানা লাল টকটক্ করছে। কিন্তু দেখতে না দেখতেই তা আবার ছাইয়ের মত

পাণ্ডুর হয়ে গেল। দিল্লীর কথার মধ্যে যেন একটু বেশি রকম ঘনিষ্ঠ সুর ছিল। আমার কানেও তা ধরা পড়ল। মনে হোলো তার ঐ ভঙ্গির প্রতিবাদ করা উচিত। কিন্তু কিছুতেই যেন কথা খুঁজে পেলাম না। এও মনে হোলো যাই কিছু বলতে যাব, তাই অত্যন্তরকম নাটকীয় হয়ে উঠবে। কিন্তু আমি যা পারিনি যোগলক্ষ্মী তা অবলীলায় পারলেন। দিল্লীকে তিনি এমনভাবে ধমক দিলেন যে, সে যেন নিতান্তই সাত আট বছরের একটি খুকি। বললেন হয়েছে, হয়েছে। লেখাপড়া শিখে ভারি পণ্ডিত হয়েছ কিনা। আমার বন্ধুদের সমালোচনা না করলে চলবে কেন ?

দিল্লী বোধ হয় এমনটা প্রত্যাশা করেনি। আমিও নয়। ক্রোধে এবং লজ্জায়, খানিক আগে তার মা'র মুখ যেমন দেখাচ্ছিল দিল্লীর মুখও তেমনি হয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই সপ্রতিভ পরিহাসের সুরে সে বলল, বন্ধুদের নিন্দা শুনলে মেজাজ আর ঠিক রাখতে পার না বুঝি। কথায় কথায় আজকাল এমন ক্ষেপে যাচ্ছ যে, আমার ভয় হচ্ছে এতদিনে সত্যি তুমি বুড়ি হয়ে পড়লে। বসো, একটু চায়ের ব্যবস্থা করা যায় কি না দেখি। গরম চা না হলে তোমার মেজাজ আজ আর ঠাণ্ডা হবে না।

দিল্লী উঠে যাওয়ার পরও একমুহূর্ত যোগলক্ষ্মী গম্ভীর হয়ে রইলেন, তারপর কণ্ঠকে যথাসাধ্য প্রসন্ন এবং সহজ করতে চেষ্টা ক'রে বললেন, আচ্ছা ত্রিলোকেশ।

আমি তাঁর চোখের দিকে সহসা তাকাতে পারলাম না। সেদিন ভেবেছিলাম আর কোনো ভয় নেই, আর কোনো সংকোচ নেই আমার, কিন্তু তখন কি জানি নতুন ভয়, নতুন লজ্জা এমন ক'রে সঞ্চিত হয়েছিল।

বলুন।

আমি ভাবি কি ক'রে তুমি এতদিন মাষ্টারি করলে, ছেলে মেয়েরা দুষ্টুমি করলে আচ্ছা ক'রে একটা ধমকও দিতে পার না?

কথাটা কেবল যেন তিরস্কার নয়। তা হলে কি এত মধুর শোনাত? মনে পড়ল কল্যাণীও যেন ঠিক এই ভঙ্গিতে অনুযোগ করে।

বললুম, ধমক কি আর সকলের গলাতেই মানায়? কারো কারো ধমক এমন হয় শুনতে যে, ছেলেদের কাছেও তা ভয়ংকর না হয়ে হাস্যকর হয়ে ওঠে।

কথা শুনে যোগলক্ষ্মীও হাসলেন, তবু আড়ালে আড়ালে একটু একটু চর্চা কোরো, না হলে ছেলেমেয়েরাই একদিন ধমকাবে দেখো।

কিন্তু যোগলক্ষ্মীর ধমক খেয়েও দিল্লী ফিরল না। বরং ধমক খেয়েছে বলেই সে যেন আরো বেড়ে উঠল। আমি যত তাকে এড়াতে চেষ্টা করি, নানা কাজে আমাকে তত তার প্রয়োজন পড়ে। এটা যে যোগলক্ষ্মীর ওপর তার জেদ সে সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না, তবু একেবারে নিঃসন্দেহ হতেই কি ইচ্ছা করত?

দলের বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে দিল্লী একটা কাগজ বের করত। এবং বলা বাহুল্য সেই ছিল তার সম্পাদক, এই কাজে সহায়তা করবার জন্যে আজকাল প্রায়ই আমার ডাক পড়ে।

একদিন বললুম, কিন্তু পরামর্শটা হয়ত তোমাদের দলে কু-পরামর্শ বলেই গৃহীত হবে, কেন মিছামিছি তোমাদের বন্ধুদের ক্ষুণ্ণ করবে দিল্লী?

ভাববেন না, আমার বন্ধুরা আপনার মত সহজে ক্ষুণ্ণ হবার পাত্র নয়। তারপর দিল্লী একটা লেখা বের ক'রে একটু মুচকি হেসে বলল, তাই বলে এটা কিন্তু অমনোনীত ক'রে বসবেন না। এ কেবল আমার বন্ধুদের ক্ষুণ্ণ করা নয়, বুঝেছেন?

নাম নেই তবু লেখার ধরনে বুঝতে পারলুম গল্পটা দিল্লীর নিজের, শুধু তাই নয় ইদানীং আলাপ আলোচনায় যে সব কথা বলেছি তার অধিকাংশই দেখি রচনাটির মধ্যে স্থান নিয়েছে। এমন কি আমার বলবার ভঙ্গিটি পর্যন্ত যেন অক্ষরে অক্ষরে গাঁথা। লিখতে পারি না বলে আর যেন কোনো ক্ষোভ আমার রইল না। মনের কথা কলমের আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলার কষ্ট এবং আনন্দের সঙ্গে এতকাল পরিচয় ছিল, কিন্তু অন্য কারো লেখায় তার নিখুঁত প্রতিবিম্ব পড়লে যে অনুভূতি মনের মধ্যে তীব্র হয়ে ওঠে তার সাক্ষাৎ জীবনে এই প্রথম পেলাম।

বললুম, করেছ কি, ধরা পড়ে যাবে যে।

দিল্লী বলল, অতই কাঁচা মনে করেছেন বুঝি? ধরা পড়বার ভয় তো কেবল একজনের কাছে? আগে ভাগে তাকেই যদি ধরিয়ে দিই—

চক্রান্তটা ঠিক ধরতে পারছি না।

দিল্লী মুচকি হেসে বলল, গল্পটা আপনার নামে ছাপব।

সন্ত্রস্ত হয়ে বললুম, পাগল নাকি? এমন কাজও কোরো না।

দিল্লী বলল, ধরা পড়বার ভয় তা হলে কেবল আমারই নয় দেখা যাচ্ছে।

ভয়! ভয়ের কথা তখন পর্যন্ত আমার মনেই আসেনি কিংবা এলেও সন্তর্পণে তাকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছি। প্রৌঢ়ত্বের সীমান্তে এসে নতুন কোনো ভয় নতুন কোনো ঝুঁকি নেওয়ার মত প্রবণতা মনের আর থাকে না। অভ্যস্ত দিনযাত্রার ফাঁকে যদি কোনো নতুন বিস্ময়ের সন্ধান মেলে তাকে নিরাপদ মসৃণতায় শোধন না করা পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা যায় না।

সংসার চিন্তা এবং অফিসের ক্লান্তিকর খাটুনির পর অবসরটা এ ধরনের বিশ্রম্ভালাপে বেশ কাটছিল। মনে মনে এই আশাই হয় তো ক'রে

রেখেছিলাম চিরকাল এমনি করেই কাটবে। এই পরিমিত স্বল্প সময়টুকু ভরে একটি সূক্ষ্ম রসধারা অনন্তকাল ধরে বয়ে চলবে, তাতে কোনোদিন ঝড় উঠবে না প্লাবন আসবে না, ভয় করবার কিছু থাকবে না।

যোগলক্ষ্মী মাঝে মাঝে বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলতেন। এই বয়সেও তাসে এমনভাবে মত্ত হয়ে যেতে দেখে আমি বিস্মিত না হয়ে পারতুম না। খেলাটা যেন তাঁর কাছে কেবল খেলাই নয়, কাজের মতই গুরুতর ছিল। খেলার ভুল হলে তার ব্যঙ্গ আর তিরস্কারের হাত থেকে হতভাগ্য সঙ্গীর ত্রাণ পাওয়ার যো ছিল না। আমি মাঝে মাঝে দর্শকের দলে গিয়ে বসতাম, যোগলক্ষ্মীর রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে কোনোদিন যেমন আমার যোগ ছিল না তেমনি তাস খেলাতেও তাঁর সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য আমার কোনোদিন হয়নি।

তাসের আসরে সেদিন যোগলক্ষ্মীর বিশেষ বিশেষ বন্ধুর সমাগম হয়েছিল। নগেনবাবু ছিলেন। এলাহাবাদ থেকে ছুটিতে এসেছিলেন অধ্যাপক যতীনবাবু। আমারই সমবয়সী। এরই মধ্যে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে উঠেছিল। আজ তিনিই আমাকে টেনে নিয়ে কাছে বসালেন, 'খেলাটেলা এক আধটু শিখুন ত্রিলোকেশবাবু।'

কি একটা কাজের অছিলায় দিল্লী একবার এ ঘরে এসে ঘুরে গেল। তারপর আর একটু বাদেই এল শম্ভু। আমার কাছে এসে বলল, 'পড়ার ঘরে দিদিমণি আপনাকে ডাকছেন।'

সবাই একবার ওর দিকে অর্থবোধক ভঙ্গিতে তাকালেন। তারপর হঠাৎ যেন আপন আপন তাসগুলির ওপর গভীর মনোযোগী হয়ে পড়লেন প্রত্যেকে।

যতীনবাবু বললেন, 'আপনাকে এখানে মাষ্টারীও করতে হয় তা তো

বলেননি। তারপর তাসগুলি উঁচু ক'রে নিজের মুখ আড়াল করলেন। বোধহয় হাসি গোপন করবার জন্যে।

যোগলক্ষ্মীর কথায় চমকে উঠলাম। তিনি অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলছেন, 'যাও ত্রিলোকেশ একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়ে এসো। পরীক্ষার চাপে শ্রীমতীর এতদিন বোধ হয় সুমতি হোলো। আমি তো হাজার বার বলেও ওকে একবার বই নিয়ে বসাতে পারিনে, তুমি জাত মাষ্টার, তোমার ধমকটমকে যদি কিছু কাজ হয়।' তারপর যতীনবাবুর দিকে তাকিয়ে তিনি একটু হাসলেন, 'মাষ্টারীর কথা বলেছিলেন, ও বড় সাংঘাতিক জিনিষ। একবার ও ব্যবসা নিলে আর রক্ষা নেই। আপনি ছেড়ে দিলেও তা আপনাকে ছাড়বে না।'

যোগলক্ষ্মীর দিকে একবার তাকালাম। তখনো তাঁর মুখে হাসি লেগে রয়েছে। কী এই হাসির অর্থ। একি তাঁর ব্যঙ্গ, একি তাঁর অভিমান কিংবা দুই-ই?

গম্ভীর মুখে সিঁড়ি বেয়ে দিল্লীর পড়বার ঘরে এসে উপস্থিত হলাম। চায়ের সরঞ্জাম সামনে ক'রে বসে নিজের মনে সেগুলি নিয়ে দিল্লী যেন খেলা করছে। সুন্দর একখানি টেবিলঢাকনিতে মোড়া ছোট্ট গোল টেবিলটার ওপর ফুলদানীতে দু'টি চন্দ্রমল্লিকা। আমাকে দেখে দিল্লী বলল, 'আসতে পারলেন এতক্ষণে?'

বললুম, 'হুঁ, কি ব্যাপার বল দেখি?'

'বাঃ, কথাটা যে আমিই জিজ্ঞেস করব ভেবে রেখেছি। ব্যাপার কি, হঠাৎ অমন তাসে মেতে উঠলেন যে? অথচ খেলার তো কিছু জানেন না। ফাঁকি যাদের দিতে চান তারা আপনার চেয়ে ঢের চালাক। অনর্থক পণ্ডশ্রম ক'রে লাভ কি। তার চেয়ে নিশ্চিন্তে চুপ চাপ বসে চা খাওয়া অনেক ভালো।'

এক কাপ চা আমাকে এগিয়ে দিয়ে আর এক কাপ দিল্লী নিজের দিকে টেনে নিল।

ওর এ ধরনের প্রগল্ভতা আমার অপরিচিত নয়। কিন্তু আজ যেন তা সমস্ত সীমা অতিক্রম ক'রে যাচ্ছে মনে হোলো। ওর গাঢ় রক্তবর্ণ দু'টি প্রবালের দুলে, কবরীর উদ্ধত ভঙ্গিতে পৃথিবীর সমস্ত অসংযম, সমস্ত আতিশয্য যেন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল।

এ সব অবশ্য এখন যেমন ক'রে আমি দেখতে পাচ্ছি সেদিন ঠিক তেমন ভাবে দেখিনি। আমার চোখের সামনে তখন যোগলক্ষী আর তাঁর বন্ধুদের সকৌতুক চোখগুলি বারংবার ভেসে ভেসে উঠেছে।

ওর সামনে সোফাটায় বসলুম। কিন্তু চা আমি স্পর্শ করলুম না, বললুম শম্ভু আমাকে বলছিল আমার কাছ থেকে পরীক্ষার পড়া নাকি তোমার বুঝে নেবার আছে।'

দিল্লী মৃদু হাসল, 'ও ছাড়া শম্ভু আর কি বলতে পারত।'

আর হঠাৎ ওর সেই হাসি, সেই ছোট্ট টুক্‌রো টুক্‌রো কয়েকটি কথায় আমার মনে হোলো পৃথিবীতে এর চেয়ে দুঃসহতর অশ্লীল কিছু যেন আর হতে পারে না। ও যখন আরও স্পষ্ট, আরও মুখর হয়ে উঠবে কি ক'রে আমি তা সহ্য করব।

হঠাৎ উনিশ কুড়ি বছর আগেকার আরেকটি দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেদিন অসহ্য আবেগে একটি যুবক যোগলক্ষ্মীর এক খানি হাত নিজের মুঠির মধ্যে চেপে ধরেছিল। আজ বুঝতে পারছি কেন যোগলক্ষ্মী সেদিন একবার শিউরে উঠে পাথরের মত অমন নিঃস্পন্দ হয়ে গিয়েছিলেন, তারপর একটু পরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কেমন ক'রে বলতে পেরেছিলেন, 'ছিঃ, কি ছেলেমানুষি হচ্ছে ত্রিলোকেশ।'

আমার ভাবান্তর হয়তো দিল্লী তখনো লক্ষ্য করেনি। কিংবা লক্ষ্য করলেও

আমল দিতে চায়নি। নিজের ঐশ্বর্যে ও তখন পরিপূর্ণ। আমার দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'হঠাৎ অমন গম্ভীর হয়ে গেলেন যে। চা খান। ভালো কথা আপনাকে একটা খবর তো এতক্ষণ দিইনি।'

শুষ্ক কণ্ঠে বললুম, কি খবর ?

'একটা দিন সবুর করতে পারলে খবরটা আপনাকে চাক্ষুষ দেখাতে পারতাম, কিন্তু সবুর করা আর আমার স্বভাবে নেই। তাতে মেওয়া যদি না ফলে না ফলল। সেই গল্পটা প্রেসে দিয়েছি আর আমাদের দু'জনের নামে সেটা বেরুচ্ছে। ভেবে দেখলাম ধরা বদি পড়তেই হয় দু'জনে একসঙ্গে পড়াই ভালো।'

মুহূর্তকাল আমি যেন কোনো কথা বলতে পারলাম না। এ আমি করেছি কি! নিজেকে এমন করেই ছেড়ে দিয়েছি যে, দিল্লীর মত এতটুকু ঐ মেয়ে আমাকে খেলার সঙ্গী ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারে না? আমার বয়স, আমার সাংসারিক আর সামাজিক প্রতিষ্ঠা কিছুরই কি গুরুত্ব নেই, ওর লঘু চাপল্যে সমস্তই কি এমন ক'রে ভাসিয়ে দেওয়া যায় ?'

হঠাৎ কঠিনকণ্ঠে বললাম, 'আমার নাম নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলবার স্পর্ধা তোমার কাছে থেকে আশা করিনি দিল্লী।

মুহূর্তকাল বিস্মিত হয়ে দিল্লী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর অদ্ভুত একটু হেসে বলল, 'অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন ? যাতে কেউ কিছু মনে না করতে পারে, তার জন্যে ব্রাকেটে দু'জনের বয়সের কথাটা উল্লেখ ক'রে দিলেই হবে।

জবাবে কি একটা কথা বলতে গেলাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে কোনো কঠিন কথাই বাংলা কি ইংরাজী ভাষায় খুঁজে পেলাম না। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। সিঁড়ির মুখেই নিচের ঘর থেকে তুমুল হাস্যধ্বনি শুনতে

পেলাম। তাসের আসরে হয় তো নতুন কোনো কৌতুকের কথা উঠে থাকবে।

নিভন্ত চুরুটটা সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ত্রিলোকেশবাবু একটু হাসলেন, 'চলুন আমরাও এবার উঠি।'
বললুম, 'হ্যাঁ চলুন।'

হলদে বাড়ি

চাঁদের আলো সাদা মোমের মত গলে পড়েছে শহরের ওপর। সমস্ত রাস্তাটা মথমলে ঢাকা।

আর গলন্ত মোমের মতই নরম অঞ্জনার হাত। আঙ্গুলগুলি এমনভাবে জড়িয়ে আছে চিন্ময়ের আঙ্গুলের সঙ্গে যে, তার মনে হচ্ছে হাত ছাড়িয়ে নিলেও গলানো মোম তার হাতে জড়িয়ে থাকবে। হাত অবশ্য ছাড়িয়ে নিল না চিন্ময়, অঞ্জনার হাতখানা তুলে নিয়ে নিজের ঠোঁটে ছোঁয়াল।

কয়েকজন লোক অঞ্জনার একেবারে ডান কাঁধ ঘেঁষে চলে গেল। কোনো রকমে কাঁধটা সংকুচিত ক'রে স্পর্শ বাচাল অঞ্জনা।

দেখেছ রাস্তায় কি ভিড়!

চিন্ময় বলল, 'অন্তত চারগুণ লোক বেড়েছে ক'লকাতায়।'

'আরো বেশি, আরো বেশি। কিন্তু যাই বল, এবার সত্যি সত্যি কসমো-পলিটান শহর হয়ে উঠল ক'লকাতা। আমেরিকান, অষ্ট্রেলিয়ান সব এসে তাঁবু পেতেছে, না আছে এমন দেশ নেই। বেশ লাগে আমার। শুধু যদি ওদের চেহারাটা অত কুৎসিত না হোতো।'

চিন্ময় হাসল, 'ভারি একটা আফ্‌সোসের কথা বটে।'

অঞ্জনা বলল 'দেখ যুদ্ধ জিনিষটা আমার কাছে যে খুব অপছন্দের তা নয়। কিন্তু এখনকার মারণাস্ত্রগুলি বড় অসুন্দর। তরোয়ালের মত সূক্ষ্ম

ধারালো ঝক্ঝকে নয়। বড় স্থূল, জটিল সব যন্ত্র। অনেকখানি জায়গা জুড়ে সব পড়ে থাকে। তাই যুদ্ধক্ষেত্রের ও আজ সমস্ত পৃথিবী না জুড়লে চলেনা।
চিন্ময় বলল, 'হ্যাঁ, প্রাসাদের জানালা খুলে বসে বসে দেখবে, তারপর বিজয়ীর কণ্ঠদেশ লক্ষ্য ক'রে বরমাল্য দেবে ছুঁড়ে তার উপায় নেই। এ যুদ্ধে বরং সভয়ে জানালা দরজা বন্ধ ক'রে রাখতে হয়, কখন বোমার গুঁড়ো এসে চোখে পড়বে। বড় প্রোজেইক।'
অঞ্জনাও হাসল, 'তা ছাড়া কি। ঝক্‌ঝকে ইস্পাতের তলোয়ার, আর প্রবালের মত গাঢ় টকটকে লাল রক্ত, ভেবে দেখ তো কি সুন্দর, কোনো বাহুল্য নেই, সূক্ষ্ম পরিচ্ছন্নতা। সে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সত্যি বলা যায়, মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান। এদিক থেকে সেকালই আমার পছন্দ।'
চিন্ময় হাসল, 'তোমার পছন্দের তারিফ করছি। তবে ওটা কিন্তু সেকালও নয় এ কালও নয়, কেবল যাত্রার কাল।
অঞ্জনা মুখ ভার করল, 'বেশ বেশ, যাত্রাই হোলো, ভারি তো ঐতিহাসিক। কেবল তথ্য খুঁটে খুঁটে গেলে। তার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারলে না।
চিন্ময় বলল, 'মারাত্মক আঘাত হেনেছ এবার। সন্ধি প্রার্থনা করছি।'
অঞ্জনা হাসল, 'বিনা সর্তে তো ?'
চিন্ময় বলল, না একেবারে বিনাসর্তে নয়, দু'একটা সর্ত আছে।
পথ দিয়ে যেন ওরা হেঁটে যাচ্ছে না, হাওয়ায় ভেসে চলেছে। রাস্তায় ভীড় এখনো আছে। ট্রাম বাস আর ট্যাক্সি চলছে সশব্দে। পেভ-মেণ্টের ওপর স্থানে স্থানে কতকগুলি লোক হাত-পা জড়ো ক'রে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়েছে। অভ্যাসবশে তাদের পাশ কাটিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছে চিন্ময়, আর তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করছে অঞ্জনা। দু' পাশের বাড়িগুলি স্তব্ধ দাঁড়িয়ে। জোৎস্নায় ভিজে উঠেছে কিন্তু বর্ণ

গন্ধ ধ্বনি ভরা এই পরিচিত পৃথিবী ওদের কাছ থেকে যেন অবলুপ্ত হয়ে গেছে। সব কিছুতে মিলিয়ে আছে শুধু একটা অশরীরী সৌরভ, বহুদূর থেকে ভেসে আসা অস্পষ্ট সেতারের মধুর একটা টান। কিন্তু আরো খানিকটা এসে একটা গলির মোড়ে এই জোৎস্নার সমুদ্রের মধ্যে কদাকার এক কুমীরের পিঠ ভেসে উঠল অঞ্জনার চোখের সামনে।

রাস্তা থেকে কয়েক হাত দূরে গলির মধ্যে ডানদিকে বড় একটি ডাষ্টবিন। তারই ভিতর ঝুঁকে পড়ে একটা লোক দু'হাতে কি ঘাঁটছে, তার পিঠটা কেবল দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ পায়ের শব্দ পেয়ে লোকটা মুখ তুলে তাকাল। হাতে তার কিচ্ছু ওঠেনি। কেবল তরল খানিকটা জিনিষ দু'হাতে জড়িয়ে গেছে। তাতে জিভ লাগিয়ে একটু চেটে লোকটিও মুখ বিকৃত করল। তারপর অঞ্জনাকে দেখে ছুটে এসে হাঁটু গেড়ে দু' হাতে তার জানু পর্যন্ত জড়িয়ে ধরল। মুহূর্তের মধ্যে কাণ্ডটি ঘটে গেল। চিন্ময় কি অঞ্জনা বাধা দেওয়ার অবকাশ পর্যন্ত পেল না। দু'জনেই একটুকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর অঞ্জনা নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'ছি ছি, ছাড়ো ছাড়ো।'

প্রত্যুত্তরে লোকটি অঞ্জনার হাটু দুটি আরো আঁকড়ে ধরে প্রায় নিজের বুকের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলল, তারপর উর্ধ্বে অঞ্জনার মুখের দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস ক'রে কি বলল বোঝা গেল না।

অঞ্জনা আবার অসহায়ের মত বলল, ছাড়ো ছাড়ো।

পাশ থেকে চিন্ময় ধমক দিয়ে উঠল, 'এই ছাড়্ ছাড়্ শিগ্‌গির।'

লোকটি যেন ভ্রূক্ষেপই করল না, বার দুই জুতার ওপর মুখ রাখল অঞ্জনার, তারপর আবার মুখের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট শব্দ ক'রে উঠল। তার মুখের বিকৃত ভঙ্গিতে কেবল বোঝা গেল সে কাঁদতে চাচ্ছে।

অঞ্জনা তিরস্কারের সুরে চিন্ময়কে বলল, 'তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল মজাই দেখবে?'

এবার চিন্ময় বাহু ধরে লোকটিকে ছাড়িয়ে নিল। ধমক দিয়ে বলল, 'দূর থেকে চাইতে পারিসনে? পা ধরতে গেলি কোন সাহসে?'

অঞ্জনা বিরক্তকণ্ঠে বলল, 'থাক্ থাক্ বীরত্ব খুব দেখা গেছে। এবার কিছু দিয়ে ওকে বিদায় ক'রে দাও।'

চিন্ময়ও নিরুত্তরে গম্ভীর মুখে ব্যাগ খুলে একটা সিকি ছুঁড়ে দিল লোকটার দিকে।

আরো খানিকটা পথ হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে গিয়ে অঞ্জনা ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় থামল। পরমুহূর্তে চিন্ময় গিয়ে আলগোছে অঞ্জনার কাঁধে হাত রাখল।

অঞ্জনা শিউরে উঠে কাঁধটাকে সংকুচিত করল, 'ছি ছুঁয়ো না আমার সমস্ত গা ঘিন্ ঘিন্ করছে। বাড়ি গিয়ে স্নান না ক'রে নিলে আর ভালো লাগবে না। আর তুমিও বা কি রকম, ঐ হাত দিয়েই না লোকটাকে সরিয়ে দিয়েছিলে—আর সেই হাতই আমার কাঁধে রাখছ?

এ সময় কথা কাটাকাটি করলে ফল আরো খারাপ হয়। চিন্ময় গম্ভীর মুখে হাতটা সরিয়ে নিল।

অঞ্জনা এবার কোমলকণ্ঠে বলল, 'আর হাঁটতে ইচ্ছা করছে না। এখনো বেশ খানিকটা পথ। একটা ট্যাক্সি ডাকবে?'

চিন্ময় বলল, 'এখনি ডাকছি। অনেক আগেই ডাকা উচিত ছিল।'

ট্যাক্সিতে উঠে অঞ্জনা বেশ একটু ফাঁক রেখে সরে বসল। আবার বলল, ভারি গা ঘিন্ ঘিন্ করছে। বাড়ি গিয়ে ভালো ক'রে চান ক'রে ফেলতে হবে।'

শুচিতার বাড়াবাড়িতে অদ্ভুত শুচিবায়ুতা দাঁড়িয়ে গেছে অঞ্জনার।

ঠিক ওর ঠাকুরমার মত। ওর মাও নাকি এমনি ছিলেন শোনা যায়।

যেন একটা বাংলা দৈনিক পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করছে এমন ভাবে চিন্ময় বলল, 'ওদের সব এখন হাসপাতালে পাঠান হচ্ছে!'

অঞ্জনা বলল, 'তাই তো দেখছি কাগজে।'

তিন চার মিনিটের মধ্যে বাড়ির সামনে এসে ট্যাক্সি থামল। জ্যোৎস্নার সমুদ্রে সাদা একখানা জাহাজ নোঙর ফেলে রয়েছে। আসলে রঙ এই জাহাজী প্যাটার্ণের বাড়িখানার সাদা নয়, হাল্কা হলদে। রাত্রে এমন দেখাচ্ছে! ধব্‌ধবে সাদা রঙ পছন্দ রমলার, কিন্তু অঞ্জনা ভক্ত হলুদ রঙের, সোনালি হলুদ।

ক্ষিতীশবাবু ছোট মেয়ের পছন্দমতই রঙ করিয়েছেন বাড়িখানার। আর রমলার পছন্দ অনুযায়ী রঙ রাত্রে হয়ে যায়।

হলদে রঙ পছন্দ অঞ্জনার। জানালা দরজায় হলদে রঙের পর্দা, ফুলদানির ফুল আর কাঁচের আলমারির সারিগুলি প্রায়ই সব হলদে।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে গম্ভীর মুখে দু'জনে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠল।

ডান দিকের আর একটা ঘরে ক্ষিতীশবাবু ঝুঁকে পড়ে যুদ্ধ সংক্রান্ত একটা বই লিখছেন। পেন্‌সনের পর যুদ্ধ সম্বন্ধে ভারি কৌতুহলী হয়ে উঠেছেন ক্ষিতীশবাবু। ঘরের দেওয়ালগুলিতে নানা দেশের বড় বড় মানচিত্র, আলমারিগুলিতে মোটা মোটা বই। সাময়িকপত্রে বিভিন্ন ছোট ছোট আর্টিকেল লিখে এবার একটা বড় বইয়ে তিনি হাত দিয়েছেন—তাই নিয়েই ব্যস্ত। কাল তাঁর তেষট্টিতম জন্মতিথি গেছে। সেই উপলক্ষে মেয়ে, জামাই আর ভাবীজামাই চিন্ময় এসেছেন। আজও তাঁদের যেতে দেননি। রবিবার অফিস আদালত সবই তো

বন্ধ, কি এমন কাজকর্ম থাকতে পারে, যা থাকে কাল করলেই চলবে।'

তেতালার বড় রুমটায় ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চুরুট টানছেন অর্জুনবাবু। রমলা শঙ্কিত মুখে বারবার দোরের কাছে আসছে আর ফিরে গিয়ে বসছে।

দোরের পাশে এসে দু'জনে দাঁড়াতেই অর্জুনবাবু বললেন, 'এই যে এসেছ, তোমার দিদি তো অস্থির হয়ে উঠেছেন এরই মধ্যে।'

অঞ্জনা বলল, 'অস্থির হবার কি আছে, আসছি।'

তারপর পূবদক্ষিণ কোণে তার নিজের ঘরটায় গিয়ে ঢুকল।

অর্জুনবাবু বললেন, 'কি ব্যাপার, হঠাৎ এমন ছদ্ম গাম্ভীর্য কেন? সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দু'জনে মিলে পরামর্শ ক'রে এসেছ বুঝি?'

রমলা উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'অঞ্জু ওভাবে মুখ গম্ভীর ক'রে চলে গেল যে? রাস্তায় কোন কিছু ঘটেনি তো?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চিন্ময়ের দিকে তাকালেন রমলা।

চিন্ময় ভারি বিরক্ত বোধ করল। এই ডিটেকটিভগিরির কি মানে হয়? তারপর অর্জুনবাবুর দিকে চেয়ে চিন্ময় জবাব দিল, 'কি আবার ঘটবে। একটি লোক হঠাৎ অঞ্জনাকে পথের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছিল।'

আতঙ্কে অস্ফুট শব্দে ক'রে উঠলেন রমলা। কিন্তু অর্জুনবাবু হেসে উঠলেন হো হো ক'রে। বললেন, ন্যারেশনটা থার্ড পার্সনেই সুবিধা বটে লোকটিকে দোষ দেওয়া যায় না; এমন জ্যোৎস্নাধবল রাত, জনবিরল পথ। ওই তো সম্পূর্ণ কাঙ্খিত পরিণতি! ওতে আকস্মিকতার কি আছে?'

চিন্ময় বিরক্ত হয়ে বলল, 'পা জড়িয়ে ধরেছিল একটা ভিখিরি।'

এবারো অর্জুনবাবু হাসলেন, 'একেবারে পা? তা কি করবে ভাই, মাঝে মাঝে ভিখিরিও সাজতে হয় বইকি।'

চিন্ময় এবার অসহায়ভাবে রমলার দিকে তাকাল। রমলা ধমক দিয়ে উঠলেন অর্জুনবাবুকে, 'কি যা তা আরম্ভ করেছ। ভালো লাগে না। সব সময়েই তোমার রসিকতা?'

তারপর আদ্যোপান্ত সব শুনে রমলা আরো শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। দু' তিন বছর বয়সেই মা মারা যায় অঞ্জনার, সন্তান স্নেহে রমলাই এই ছোট বোনটিকে মানুষ ক'রে তুলেছেন।

একটু চুপ ক'রে থেকে রমলা বললেন, যে মেয়ে, এখন একটা কাণ্ড-কারখানা না ঘটালেই বাঁচি।

অর্জুনবাবু বললেন, 'কাণ্ড আবার কি ঘটাবে। তুমিও যেমন, গেল কোথায়?'

রমলা বললেন, কোথায় আবার বাথরুমে। সারা রাতের মধ্যে চান শেষ হয় কিনা দেখ।

'চিন্ময় জিজ্ঞাসা করল, এমন শুচিবায়ু হয়ে উঠল কি ক'রে।'

রমলা বললেন, ছেলেবেলা থেকেই সৌখীন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা খুব ভালোবাসে! বাবা বলতেন, ও সৌখীন হবে না তো হবে কে, ও আমার সৌন্দর্যের প্রতিমা? তোরা কোন বাধা দিস না যা খুশি করুক, ওকে খুশি দেখতে ভালো লাগে না তোদের? বাড়ির কোথাও এক কণা ধূলো জমলে, কি এক টুকরো কাগজ পড়ে থাকলে ও সহ্য করতে পারে না। সেই মুহূর্তে তা পরিস্কার করিয়ে তবে ছাড়বে। ঝি চাকরদের একটুও অপরিচ্ছন্ন থাকবার জো নেই, ও নিজে তাদের পোষাক পরিচ্ছদ পছন্দ ক'রে দিয়েছে, দু'তিন রকমের। তা আবার সপ্তাহে সপ্তাহে বদলানো চাই—ওর জানালাগুলির পর্দার রঙের মত।

এমন কি চাকরদের কারো মুখে একদিনের দাড়ি জমবে তার জো নেই, ডেইলি তাদের শেভ করতে হবে। ঝিদের সে বালাই নেই। কিন্তু তাদের বিপদ চুল নিয়ে। উস্‌কো খুস্‌কো তারা থাকতে পারবে না, আবার এক ফোঁঠা তেল বেশি পড়ে গেলেও চলবে না। দেখতে একটু বেশি রকমের কুশ্রী এমন একটি ঝি একবার এ-বাড়িতে এসেছিল কাজ করতে, দু' মাসের মাইনে বেশি দিয়ে ও তাকে বিদায় ক'রে দিয়েছিল। এর আগে একটি পাঞ্জাবী ড্রাইভার ছিল নাম ইন্দ্রনাথ, ভারি সুপুরুষ। খুব ভালোবাসতো তাকে অঞ্জনা। মোটরে বসে চারপাশের আর কিছুর দিকে ওর চোখ থাকত না, কেবল ইন্দ্রনাথকে দেখত আর দেখত ওর গাড়ি চালানো।

চিন্ময় একবার চোখ তুলে রমলার দিকে তাকাল।

রমলা মৃদু হাসলেন, 'তারপর দাঁত রসায় একদিন সেই ইন্দ্রনাথের গাল উঠল ফুলে, ও আর বেরোয় না ঘর থেকে, ওঠে না গাড়িতে, মুখ ভার ক'রে ঘরের মধ্যে চুপ চাপ বসে থাকে, বললুম, কি হোলো তোর?

'ওকে তুমি হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও দিদি এক্ষুণি।'

'বলিস কিরে, আর একটা ড্রাইভার না হয় ঠিক ক'র—বাবার কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে যাবে যে।'

'তা হোক গিয়ে, তুমি পাঠিয়ে দাও।'

সমস্ত মুখটাই ফুলে গেছে, হাসতে আর পারে না ইন্দ্রনাথ, তবু কথা শুনে হাসবার অদ্ভুত চেষ্টা ক'রে সে বলল, এজন্যে আবার ডাক্তারের দরকার কি দিদিমণি, আমি এমনিতেই ভাল হয়ে যাব। অসুখের চেয়ে ডাক্তারকে ইন্দ্রনাথ বেশি ভয় করত। তার আশঙ্কা ছিল ডাক্তার দেখালে সমস্ত দাঁত তারা তুলে ফেলে দেবে। কিন্তু কিছুতেই অঞ্জু শুনবে না, না খেয়েদেয়ে পড়ে রইল। একেবারে ছোট নয় তখন, চৌদ্দপনের বছর বয়স

হবে। শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রনাথকে পাঠান গেল জোর ক'রে। কিন্তু সে আর ফিরে এল না। বোধ হয় ডাক্তারও ইন্দ্রনাথ দেখায়নি, দাঁত রসাও তার সম্পূর্ণ সারেনি। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম সে একেবারে দেশে চলে গেছে। বাবার বেশ অসুবিধা হয়েছিল ক'দিন। আর সেই প্রথম এবং সেই শেষ ওকে খুব বকেও ছিলেন। তার কয়েকদিন পর থেকেই হিষ্টিরিয়া—তাড়াতাড়ি থেমে গেলেন রমলা।

চিন্ময় আর একবার রমলার দিকে তাকাল। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল অঞ্জনা। স্নান সেরে শাড়ী বদলে এসেছে। সম্পূর্ণ নতুন দেখাচ্ছে তাকে। সৌন্দর্যের প্রতিমাই বটে। প্রসাধনের সামান্য পরিবর্তনে ওকে একেকবার এক এক রকম দেখায়। চিন্ময় মুগ্ধ হয়ে ভাবল, একি শাড়ীর রঙ, না মনের রঙ। কোনো গ্লানি নেই, ক্ষোভ নেই, দৈন্য নেই পৃথিবীতে। শুধু তরল জ্যোৎস্নায় গড়া এই সুন্দরী বসুন্ধরা। অঞ্জনা শুধু নিজেই সাজেনি, আপন সজ্জায় পৃথিবীকে সাজিয়ে তুলেছে।

অর্জুন বাবু বললেন, 'এসো।'

অঞ্জনা বলল, 'বা, আমাকে দেখেই সব চুপ ক'রে গেলেন যে।'

অর্জুনবাবু বললেন, 'তোমাকে চুপ করেই দেখতে হয়।'

কিন্তু ঐ চুরুটটা আগে ফেলে দিন। কি দুর্গন্ধ। হঠাৎ কি মনে পড়ে যাওয়ায় অঞ্জনা শিউরে উঠল, মনে হোলো শুধু চুরুটের নয় আরো যেন কি একটা বিশ্রী গন্ধ সমস্ত ঘরময় ভেসে বেড়াচ্ছে। পাপিয়ার সুরভিতেও তা ঢাকা পড়ছে না।

রমলার চোখের ইসারায় অর্জুনবাবু তাড়াতাড়ি ফেলে দিলেন চুরুটটা। রমলা বললেন, 'থাক, আর কোনো কথা নয়, চল সব খেয়ে নেওয়া যাক। বাবাকে তাঁর লেখার ঘরে গিয়েই জোর করে খাইয়ে এসেছি। যুদ্ধের বই তো নয়, তিনি যেন নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে নেমেছেন। নাওয়া খাওয়ার

সময় পর্যন্ত নেই। ব্লাড প্রেসারের রোগী, এত অনিয়ম অত্যাচার যদি সয় তো কি বলছি। আবার বেড়ে পড়বে অসুখ, তখন বুঝবেন মজা। ঠাকুর চাকরগুলি বোধহয় যোগনিদ্রায় অভিভূত। ঠেলে তুললে তবে তাঁরা উঠবেন। এসো সব।'

অঙ্গনা বলল, 'তোমরা খাও গিয়ে দিদি। আমার ভালো লাগছে না, খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'মাত্র দুটিখানি খাবি অঞ্জু, রাত্রে উপোস দেওয়া ভালো নয়।'

সব পড়ে রইল। দু'চার চামচ কোনো রকমে মুখে দিয়ে অঞ্জনা টেবিল থেকে উঠে পড়ে বলল, 'আমার ভারি খারাপ লাগছে। উঠলুম আমি।'

রমলা শুষ্ক মুখে বললেন, 'আচ্ছা তুই যা। একেবারে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। আমি আসব সঙ্গে?'

'না না, তোমার আসতে হবে না। সবতাতেই বড় বাড়াবাড়ি তোমার দিদি।'

'কিন্তু খেয়ে উঠে সবাই হাত মুখ ধুতেই অঞ্জনার ঘর থেকে অদ্ভুত শব্দ কানে এল সকলের।'

রমলা বললেন, 'আমি আগেই বুঝেছি।'

চিন্ময় বলল, 'তাহলে খেতে না দেওয়াই উচিত ছিল।'

মুহূর্তের মধ্যে অঞ্জনার ঘরের সামনে সবাই এসে জড়ো হয়েছে। বই ছেড়ে উঠে এসেছেন ক্ষিতীশবাবু। চাকরবাকরের ভিড় জমে গেছে দোরে।'

বমিতে সমস্ত ঘরটা ভেসে যাচ্ছে। শাড়ীতে লেগে গেছে খানিকটা। নিজের গায়ের গন্ধে অঞ্জনা নিজেই যেন পাগল হয়ে যাবে। একেবারে

সমস্ত বেশবাস খুলে ফেলতে চাচ্ছে অঞ্জনা, আবার সেগুলিকে চেপে ধরছে লজ্জায়।

রমলা সকলের দিকে চেয়ে বললেন, 'সরে যাও, ভিড় কোরো না এখানে। ভয় নেই অঞ্জনা।'

অঞ্জনা চারিদিকে তাকিয়ে বলল, 'কি নোংরা, কি দুর্গন্ধ, আমাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও, শিগ্‌গির সরিয়ে নিয়ে যাও, টিঁকতে পারছিনে। কি নোংরা আর কি বিশ্রী গন্ধ।'

ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ ক'রে রমলা ওর কাপড় ছাড়ালেন। তারপর পাশের আর একটা পরিচ্ছন্ন ঘরে নিয়ে খাটের ওপর শুইয়ে দিলেন ওকে। এ ঘর চিন্ময়ের জন্যে ঠিক করা হয়েছে। পূব দক্ষিণ খোলা। জানালা দিয়ে চাঁদের আলো গলে পড়ছে।

কিন্তু খাটে শুয়ে একটুক্ষণ চোখ বুঁজে চুপ ক'রে থেকে অঞ্জনা বার কয়েক নাসিকা কুঞ্চিত ক'রে কষ্টে কিসের ঘ্রাণ নিয়ে মুখ বিকৃত করল, 'উ এখনও তাই। এখনও সেই নোংরা গন্ধ, আমি টিকতে পারছি না। সমস্ত বাড়িটাই কি নোংরা হয়ে উঠল।'

আরো কয়েকবার নাসিকা কুঞ্চিত করল অঞ্জনা, 'গন্ধে টিঁকতে পারছি না, আমাকে সরিয়ে নিয়ে যাও।'

রমলা এগিয়ে এসে ধমক দিয়ে বললেন, 'এই চুপ কর, কি ছেলেমানুষি হচ্ছে অঞ্জু। চুপ।'

পাশে চিন্ময় দাঁড়ালো। রমলা তার দিকে চেয়ে চুপে চুপে বললেন, এই সময় ধমক দিতে হয়, চড়চাপড় দিতে হয় দরকার হলে। কিন্তু ঠেকানো গেল না বোধ হয়। রমলা ফিস ফিস ক'রে বললেন, 'ফিট হচ্ছে আমি আগেই বুঝেছিলাম।'

দুটো হাত অঞ্জনা টান ক'রে মেলে ধরল, আঙ্গুলগুলো দৃঢ়মুষ্টিতে আবদ্ধ।

রমলা চিন্ময়কে বলল, 'দেখ দেখি থামাতে পার কিনা।'
চিন্ময় এগিয়ে গিয়ে অঞ্জনার প্রসারিত হাতখানা আস্তে আস্তে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করল। সমস্ত শরীর ঘৃণায় সংকুচিত ক'রে শিউরে উঠল অঞ্জনা, 'ছি ছি ছি, ছাড়ো ছাড়ো।'
সঙ্গে সঙ্গে কি যেন মনে পড়ে গেল চিন্ময়ের। তারপর ধীরে ধীরে সে সরে দাঁড়াল।

গেটে মোটরের শব্দ। ডাক্তার এসে পৌঁছুলেন।

প্রতিদ্বন্দ্বী

খুসিতে রেবার মুখ আরও সুন্দর দেখায়। দোতালা বাড়িটার সমস্ত ঘরগুলি, ঘরের সমস্ত আসবাব-পত্র সে ঘুরে ঘুরে দেখে। কখনো বা জানালা দিয়ে চেয়ে দেখে বাইরের চলন্ত জনস্রোত, কখনো বা ফুলের টবগুলি হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। সরোজিনী পিছনে পিছনে আসেন আর মুচকি মুচকি হাসেন। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে রেবা জিজ্ঞাসা করে, 'সমস্ত বাড়িটাই কি আমাদের মা? কোন ভাড়াটে এসে এখানে কোন দিন থাকবে না তো?'

সরোজিনী হেসে বলেন, 'তুমি যদি থাকতে চাও তো থাকতে পার সমস্ত বাড়িই যখন তোমার।'

রেবা ঈষৎ গম্ভীর ভাবে বলে, 'নীচের তলায় অবশ্য কেউ এসে থাকতে পারে। না হলে বাড়িটা ভারি খালি খালি লাগবে।'

সরোজিনী সহাস্যে জবাব দেন, 'তা কি ক'রে হবে মা। গোটা নীচের তলাটাই যে অবিনাশের ষ্টুডিয়ো।'

রেবা আরও গম্ভীর হয়ে যায়, 'ঠিক, তাই তো।'

ওর মুখের ওপর থেকে সহজে চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছা করে না সরোজিনীর। পাথর কেটে কেটে অবিনাশ যে সব মূর্তি গড়ে, তারই একখানা যেন হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। দীর্ঘকাল ধরে এর জন্যই যেন সে এতকাল প্রতীক্ষা করছিল। দেশ-বিদেশে শুধু রূপ খুঁজেই বেড়িয়েছে

অবিনাশ। কিন্তু কিছুতেই কোন মেয়েকে তার পছন্দ হয় নি।

সরোজিনী বলতেন, 'তোর কপালে আছে কালো কুশ্রী মেয়ে। অত বাছাবাছির ফল কি কোনদিন ভালো হয় ?'

শ্যামবাজারের এক অখ্যাত গলিতে মধ্যবিত্ত এক কেরাণীর ঘরে এমন রূপ যে এতদিন লুকিয়েছিল, তা অবিনাশের ছাড়া আর কার চোখে পড়বে,—সারাজীবন ধরে পৃথিবীতে যে কেবল রূপ খুঁজেছে আর সৃষ্টি করেছে।

অবিনাশের ষ্টুডিয়োতে ঢুকে রেবা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে, 'সত্যি, কি অদ্ভুত মানুষ তুমি। আমি কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি, তুমি মোটে টেরই পেলে না।'

কি একটা অসমাপ্ত মূর্তির সামনে নিবিষ্ট মনে অবিনাশ কাজ ক'রে যাচ্ছিল, মৃদু হেসে ঘাড় ফিরাল, 'আগে থেকে টের পেলে অমন মিষ্টি হাসি কি শুনতে পেতাম ?'

হাসি বন্ধ করে রেবা জবাব দেয়, 'মা গো, কি অসভ্য তুমি। কিন্তু অসাধারণ ক্ষমতা তোমার। এত বড় আর এমন সুন্দর বাড়ি আমাদের বিজয় কাকাও করতে পারেন নি। তুমি যে এত বড়লোক, তা সত্যি আগে বিশ্বাস হয় নি।'

কেমন একটু ম্লান ছায়া পড়ে অবিনাশের মুখে, মৃদু হেসে বলে, 'তাই না কি ?'

জবাব না দিয়ে বড় বুদ্ধমূর্তিটার দিকে রেবা একবার তাকায়। আর অবিনাশ অপেক্ষমানভাবে তাকিয়ে থাকে রেবার দিকে, নিশ্চয়ই সুন্দর কোন মন্তব্য এবার তার মুখ থেকে বেরুবে। কিন্তু ততক্ষণে জানালা দিয়ে রেবার দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে রাস্তার ওপর।

'এই শোন, শিগগির এস, যদি দেখবে তো ছুটে এস শিগগির।'

রেবার কলকণ্ঠ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। অনন্যোপায় হয়ে অবিনাশকে উঠে আসতে হয়।

'কি ?'

রেবা বলে, 'দেখ ভিখারিটার দুটো পা-ই কাটা। তবু হামাগুড়ি দিয়ে কি ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে চেয়ে দেখ। পা নেই তবুও চলবে। যদি নিজেদের বাড়িতে থাকতুম, চেঁচিয়ে ওকে আমি ঠিক এদিকে ডেকে আনতুম। কিন্তু এখানে তা করতে গেলে লোকে নিন্দা করবে। কিন্তু যাই বলো ভারি অদ্ভুত লাগছে আমার। একটা পাও নেই তবু ওর চলা থামছে না।'

অবিনাশ এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থাকে, তারপর বলে, 'আর আমার তৈরি মূর্তিগুলোর দুটো ক'রে পা থাকা সত্ত্বেও এক পাও কেউ নড়ছে না, তাই নয় ? কিন্তু জানো রেবা নড়ে ওরা ঠিকই, কেবল সকলের তা চোখে পড়ে না। পুত্তলিকার চোখ আছে, দেখতে পায় না,—তেমন পুতুলের আসলে সংখ্যা মানুষেরই মধ্যেই বেশী।'

মূঢ় দৃষ্টিতে রেবা স্বামীর দিকে তাকায়। কথার অর্থ সবটা না বুঝতে পারলেও ক্রোধের আভাসটা তার কাছে অস্পষ্ট থাকে না। অবিনাশ তার ওপর রাগ করেছে, কিন্তু কেন ? বড় বড় শিল্পীদের মেজাজ কি এই রকম ? অবিনাশ যে তাকে পছন্দ করবে, একথা বাড়ির কেউ ধারণা করতে পারে নি। বাংলাদেশের নামকরা শিল্পী অবিনাশ। অনেক নামকরা সুন্দরীকে সে অপছন্দ করেছে। রেবাকে যে তার পছন্দ হয়ে গেছে এটা রেবার ভাগ্য আর শিল্পীর খেয়াল। বড়দার মুখে এই ধরনের ব্যাখ্যাই সে শুনেছে। মা বলেছিলেন, 'আর তো কোন দিক থেকে কোন আপত্তির কারণ নেই বিভূতি, তোদের মুখেই শুনছি বাংলাদেশের ইনি একজন নাম করা লোক, অবস্থাও খুব ভালো। কিন্তু

আমার রেবার তুলনায় বয়সটা একটু যেন বেশী মনে হয়, পঁয়ত্রিশ চল্লিশের কম কি হবে? আর—'

বাধা দিয়ে বিভূতি বলেছে, 'পুরুষের পক্ষে ও আবার একটা বয়স? সবাই তো আর তোমার বড় ছেলের মত নয় যে বাল্যকালেই বিয়ের পর্বটা শেষ ক'রে রাখবে। সমাজে খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জন করে তবে আজকালকার ছেলেরা বিয়ে করে। আর যে দিন কাল, তাতে প্রতিষ্ঠিত হ'তে হ'তে লোকের অতটুকু বয়সের প্রয়োজন হয়। এ তো আর বাপ-দাদার আমলের সম্পত্তি পেয়ে বড়লোক হয় নি, কিংবা পাট-রসুনের কারবারে সিন্দুক ভরে নি, শিল্পের সেবা ক'রেছে। একদিক থেকে এসেছে যশ, আর একদিক থেকে অর্থ, শুধু মূর্তিকেই তো গড়েনি, নিজের প্রতিষ্ঠাকেও গড়ে তুলেছে। হ্যাঁ, আর কি আপত্তির কথা বলছিলে—'

সৌদামিনী ভয়ে ভয়ে বলেছেন, 'না না আমার আবার আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে। পাচুর মা বলছিল—ভদ্রলোকের চেহারাখানা দেখতে ঠিক ভদ্রলোকের ছেলের মত নয়। লক্ষীপ্রতিমার মত রূপ আমার রেবার, তার বরের চেহারা যদি এমন হয়—পাচুর মা-ই বলছিল—'

বিভূতি কিছুক্ষণ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তারপর জবাব দিয়েছে, 'বাড়ির ঝিই বুঝি হয়ে উঠেছে তোমার পরামর্শদাতা। বেশ তো, সে-ই তোমার মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করুক। আমরা তো জানতুম—পুরুষের রূপের প্রয়োজন হয় না। যশ আর ঐশ্বর্যই যথার্থ রূপ। 'কন্যা বরয়তে রূপম্,' কথাটা বুঝি কন্যার জবানীতেই তুমি বললে? কিন্তু এক রূপ ছাড়া তোমার মেয়ের কি আছে বলো তো? ষোল-সতের বছর বয়স হয়েছে ভালো ক'রে বাংলা একখানা বই পর্যন্ত পড়তে পারে না। সংসারের কাজ-কর্ম কি জানে না জানে তুমিই জানো। চেষ্টা কি আমি

কম করেছি, এই অভাব-অনটনের সংসারেও দিয়েছিলাম তো ভর্তি ক'রে। কিন্তু ফি বছরে ফেল। রূপের গরবেই অস্থির, আর পড়াশুনো।'

পাশের ঘর থেকে দাদা আর মায়ের কথোপকথন কান পেতে সব শুনেছে রেবা, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে ; ভদ্রলোক এর চেয়েও যদি বুড়ো আর বিশ্রী চেহারার হোত তা হলেও তার সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় রেবার আপত্তি থাকত না। দাদার সংসারে আর একমুহূর্তও তার থাকতে ইচ্ছা নেই।

অবিনাশ অপলকে ওর দিকে চেয়েছিল। বিষণ্ণ, চিন্তিত ভঙ্গীতে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে রেবাকে। এই ভঙ্গীর একটি মূর্তি গড়তে হবে ওর। অবিনাশ মনে মনে ঠিক করল।

কিন্তু মুহূর্ত খানেক মাত্র, তার পরেই রেবার ঠোঁটে আবার হাসি ফুটে উঠেছে।

'হাসছ যে?' অবিনাশ একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

হাসি চাপতে চাপতে রেবা বলল, 'ছোড়দার কথা মনে পড়ে গেল, দাদা হলে হবে কি, ভারি ফাজিল।'

'কেন, কি ফাজলামি করেছিলেন তিনি?'

হাসিতে রেবা একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। 'তিনি'? ছোড়দা হয়ে পড়ল 'তিনি'? আমার চেয়ে মাত্র দেড় বছরের বড়। আর সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে বলে তুমি তাকে তিনি বলবে?'

অবিনাশও হাসল, 'আচ্ছা তা না হয় না-ই বললুম, কিন্তু হাসছিলে কেন?'

'ছোড়দা কি বলছিল জানো? তুমি আমাকে বিয়ে করেছ মডেল করবে বলে। প্রত্যেক আর্টিষ্টেরই নাকি দু' একটি ক'রে মডেল থাকে। অর্ডার মাফিক ঘণ্টার পর ঘণ্টা কি ভাবে তাদের কর্তার সামনে দাঁড়িয়ে

থাকতে হয় কোমর বাঁকিয়ে, ছোড়দা তাই দেখাচ্ছিল। মাগো, এমন হাসাতে পারে ছোড়দা। আর যাই কর, আমাকে কিন্তু তোমার মডেল হ'তে বলো না, ছোড়দার ভঙ্গী আমার মনে পড়বে, আর হাসতে হাসতে আমি মারা পড়ব।

অবিনাশের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছে, 'আচ্ছা যাও, মারা তোমাকে পড়তে হবে না।'

দোরের বাইরে হঠাৎ চোখ পড়ে গেছে রেবার, 'কে, মণিরাম? দাঁড়াও, দাঁড়াও তোমাকে আমি একটা জিনিষ কিনতে দেব.' রেবা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়।

আসলে জিনিস কিন্‌তে দেওয়াটা ছল। মণিরামের বরিশালী ভাষা শুনতে এবং শুনে হাসতে ভালবাসে রেবা। তার মুখের ওপরই তার অনুকরণ করে। বাড়ির অন্য কেউ এমন করলে ভারি অসন্তুষ্ট হয় মণিরাম—কিন্তু রেবাকে দেখলে সে একেবারে খাস বরিশালের ভাষা আরম্ভ করে। রেবা যত বেশী হাসে, উচ্চারণের টান মণিরাম তত বাড়িয়ে দেয়। ঘরের ভিতর থেকে তা শুনে অবিনাশের মনে হয় বরিশালী ভাষা জানা না থাকলে রেবাকে হাসাবার জন্য বিচিত্র অঙ্গ-ভঙ্গীর সঙ্গে নৃত্য পর্যন্ত করতে পারত মণিরাম, ওর মত লোকের মনেও রূপোপভোগের সাধ আছে। রূপ, কিন্তু এই মূঢ় ছেলে মানুষের রূপ দিয়ে কি করবে অবিনাশ? যার কেবল রূপই আছে, রূপবোধ নেই, রূপ-সৃষ্টির কোন কাজে যাকে লাগান যাবে না, তাকে দিয়ে কি হবে অবিনাশের?

যত দিন যায় বিরক্তি অবিনাশের তত বেড়ে ওঠে। রেবার চঞ্চল প্রাণবত্তা কিছুর মধ্যেই যেন ধরে রাখা যায় না। যত ব্যর্থ হয় অবিনাশ, তত তার ক্রোধ বাড়ে। ইতিমধ্যে অনেকবার চেষ্টা ক'রেছে রেবার মনে যাতে শিল্প-বোধ আসে, কিন্তু কোন লাভ হয়নি, এসব কথা তুললেই সে

পালিয়ে যায়। কোন না কোন ছলে চলে যায় বাইরে। ইদানীং সযত্নে বরং সে অবিনাশকে পরিহার ক'রেই চলতে চায়।

নতুন একটি দেবমূর্তিতে হাত দিয়েছে অবিনাশ। ময়মনসিংহের কোন এক জমিদারের ষোড়শী কন্যা বিধবা হয়ে ফিরে এসেছে। তাঁর মন যাতে প্রবোধ মানে, ধর্মভাব জাগে, তার আয়োজনের অন্ত নেই, দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবার দেবমূর্তির প্রয়োজন। মদনমোহনের মনুষ্যপ্রমাণ মর্মরমূর্তি অবিনাশকে গড়ে দিতে হবে।

খানিক পরে সরোজিনী ঘরে ঢুকলেন। এইমাত্র পূজার ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে এসেছেন। শ্বেত পাথরের রেকাবীতে দেবতার প্রসাদ। কয়েক খণ্ড শসা, আর দুটি নতুন গুড়ের সন্দেশ তাঁর নিজের হাতের তৈরী।

'হাত পাত অবিনাশ।'

কাজের সময় কারো বাধা অবিনাশ সহ্য করতে পারে না, ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে বিরক্তির সুরে বলে 'কেন, হয়েছে কি?'

সরোজিনী প্রসন্ন হাসেন, 'কিছুই হয়নি, প্রসাদ নে।'

'ওঃ, মিছামিছি কেন বিরক্ত করতে আসো বলোতো? প্রসাদের আমার দরকার হয় না। তোমার মত পৌত্তলিক আমি নই, তাতো জানোই।'

সরোজিনী হাসেন, 'তুই-ই বা পৌত্তলিক কম কিসে! জীবন ভ'রে এত পুতুল আর কে গড়েছে?'

সরোজিনীর সস্নেহ ব্যবহারের স্নিগ্ধতায় নিজের আচরণের জন্য মনে মনে লজ্জাবোধ করে অবিনাশ। হাত বাড়িয়ে একখণ্ড শসা তুলে নিয়ে বলে, 'তা ঠিক। পাথর কেটে কেটে সৌন্দর্য সৃষ্টির চেষ্টাই কেবল করলুম, নিজের জীবনকে সুন্দর ক'রে গড়তে শিখলুম না।'

বাৎসল্য-স্নিগ্ধ কণ্ঠে সরোজিনী জবাব দেন, 'কেন, কার চেয়ে তুই কম? কিন্তু পরের মেয়ের সঙ্গে অমন রুক্ষ ব্যবহার করিসনে অবিনাশ। দেখিসনে মেয়েটা এ ক'মাসের মধ্যেই কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে। ওর মুখ ভার দেখলে আমার ভালো লাগে না। ওর ম্লান বিষণ্ণ মুখ দেখলে আমার বুকের ভিতর যেন কেমন ক'রে ওঠে।'

অবিনাশ জবাব দেয়, 'কিন্তু সংসারে লোককে মাঝে মাঝে গম্ভীরও তো হ'তে হয় মা। মানুষের সেও এক রূপ। আচ্ছা, ওকে একবার পাঠিয়ে দিওতো এখানে।'

একটু পরে রেবা এসে উপস্থিত হয়, 'সত্যি ডেকেছ আমাকে?'

অবিনাশ বলে, 'কেন, তোমাকে কি আমি ডাকতে পারিনা। তুমিই তো আসতে চাও না এ ঘরে।'

'আসতে কি আর ইচ্ছে করে না আমার?'

'করে? কেন, বলতো?'

অর্থপূর্ণভাবে রেবা একটু হাসে, 'আহা, কিছু যেন বোঝেন না।'

বোঝে, অবিনাশ সবই বোঝে। অবিনাশের আদর চায় রেবা, তার কাছ থেকে হাল্কা গল্প-গুজব শুনতে রেবা ভালোবাসে, এ ঘরে আসে রেবা নিতান্ত অবিনাশের জন্যই; অবিনাশের সৃষ্টির দিকে বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য কি আগ্রহ নেই রেবার, কিন্তু ও ধরনের দৈহিক আরাম তো যে-কোন পুরুষই রেবাকে দিতে পারত, তার জন্য শিল্পী অবিনাশের কি প্রয়োজন ছিল। দেশ-দেশান্তর থেকে কত নরনারী অবিনাশের এই ষ্টুডিয়ো দেখতে এসেছে, দেখে মুগ্ধ হয়েছে, শুধু কোন মুগ্ধতা এলো না, বিস্ময় জাগলো না রেবার মনে, তার শিল্পকে তার সৃষ্টিকে একটুও ভালোবাসল না রেবা! স্বামীর খ্যাতি আছে, ঐশ্বর্য আছে এটুকুই সে বোঝে, তার সৃষ্টির প্রতিভাকে উপলব্ধি করবার মত বোধশক্তি রেবার নেই।

'আচ্ছা রেবা, ষ্টুডিও ভ'রে নানা রকমের এত যে মূর্তি, এর কোনটিই কি তোমার মনে আনন্দ দিতে পারল না, এর কিছুই কি তোমার ভালো লাগে না, সত্যি বলো তো ?'

রেবা জবাব দেয়, 'বাঃ ! তোমার নিজের হাতে তৈরি জিনিষ, আর আমার ভালো লাগবে না ? সব আমার ভালো লাগে ?' নৈরাশ্যের বিবর্ণ হাসি অবিনাশের ঠোঁটে কিছুক্ষণ লেগে থাকে।

ঝুলনের আগেই মূর্তি সম্পূর্ণ ক'রে পাঠিয়ে দিতে হবে। দিনরাত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করতে হয় অবিনাশকে। মূর্তি শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু আশ্চর্য জমিদারের তরফ থেকে কোন খোঁজ-খবর নেই। অবশেষে দু'দিন পরে সহরের ম্যানেজার এসে উপস্থিত হলেন। অন্য কি কার্যোপলক্ষে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন, যাওয়ার পথে হয়ে গেলেন অবিনাশের বাড়ি। অবিনাশ বলল, 'কি ব্যাপার ? মূর্তি কি নেওয়ার ইচ্ছা নেই আপনাদের ?'

ম্যানেজার বললেন, 'আমরা ভারি লজ্জিত মশাই, যার জন্য মূর্তির দরকার ছিল, তার আর প্রয়োজন নেই।'

ম্যানেজার গোঁফের তলায় মুচকি হেসে বললেন, 'সে সব বড় ঘরের বড় কথা আমাদের মুখে সাজে না।'

অবিনাশ মহাবিরক্ত হয়ে উঠেছিল।

'বেশ, না সাজে না বলবেন। শুধু এইটুকু আমি শুনতে চাই, মূর্তিটি আপনারা নেবেন, না আর কাউকে বিক্রি ক'রে দেব ?'

ম্যানেজার বললেন, 'আহা শুনুনই না মশাই আগাগোড়া, তারপরে চটবেন।'

'বলুন।'

'বলব কি মশাই বড় ঘরের সব বড় বড় কথা। আমি কিন্তু আগে

থাকতেই একটু একটু টের পেয়েছিলাম। পুরাণ মন্দিরের ঠিক সংলগ্নই আমার বাসা কি না। আসতে যেতে সব আমার চোখে পড়ত। কর্তা আর গিন্নী অবশ্য বলাবলি করতেন—মল্লিকার ধর্মে ভারি মতি হয়েছে, ঠাকুরের ওপর অচলা ভক্তি। আমি দেখতুম ঠাকুরের ওপরই বটে, তবে শালগ্রাম ঠাকুরের ওপর নয় পুরোহিত ঠাকুরের ওপর। বুড়ো বাপের বাতব্যাধি হওয়ায় যজমানী কাজে ছোকরাই আসত কি না।'

'তারপর।'

'তারপর আর বলবার মত কথা নয়। নানা কেলেঙ্কারী ব্যাপার। এই দুর্ঘটনার পর থেকে মেয়ে, মন্দির, মদনমোহন, সব কিছুর ওপরই কর্তা ক্ষেপে গেছেন। কার ঘাড়ে দুটো মথো আছে যে মূর্তির কথা তাঁকে মনে করিয়ে দেয়?' ম্যানেজার আর একবার দেবমূর্তিটির দিকে তাকালেন। 'কিন্তু যাই বলুন মূর্তিটি ভারি চমৎকার হয়েছে আপনার। অবশ্য মুখে দেবভাবের কিছু অভাব আছে। যা হোক আমি তো আর জমিদার নই, তাঁর সামান্য কর্মচারী মাত্র, তাঁর মত অত টাকা তো আর আমি দিতে পারব না। শ'দুয়েক টাকার মধ্যে যদি দেন আমাকে, মূর্তিখানি আমি নিয়ে যাই।'

ক্রোধে বিকৃত হয়ে উঠল অবিনাশের মুখ। 'আজ্ঞে না ধন্যবাদ।'

পাশের ঘর থেকে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রেবা সব শুনছিল আর সকৌতুকে হাসছিল, অবিনাশের কর্কশ কণ্ঠে চমকে উঠল। রাগলে যেন আরও বেশী কুশ্রী দেখায় অবিনাশের মুখ। আর তারই পাশে চোখে পড়ল মদনমোহনের মূর্তি, স্থির প্রসন্ন হাসি হাসি মুখটিতে অনুক্ষণ লেগে রয়েছে। সত্যিই ভারি সুন্দর হয়েছে তো মূর্তিখানা। মনে মনে কথাটা রেবা আবৃত্তি করলে।

ম্যানেজার বিদায় নিলে রেবা ছুটে এল ঘরে, 'এই শোন, মূর্তিটি

কাউকে বিক্রি করতে পারবে না কিন্তু ওটি আমি নেব, ভারি চমৎকার হয়েছে।'

অবিনাশ শ্লেষের হাসি হাসল, 'ম্যানেজারের মুখ থেকে কথাটা মুখস্ত ক'রে নিয়েছ বুঝি।'

'বাঃ! তা কেন? সত্যি আমার ভারি ভালো লেগেছে।'

অবিনাশ বলল, 'তাই নাকি? আমার অসীম সৌভাগ্য। কিন্তু দু'দিনের মধ্যে হাজার টাকায় মূর্তিটি বিক্রি হয়ে যাবে দেখে নিয়ো।'

রেবা বলল, 'হাজার টাকা তুমি আমার কাছ থেকে নিয়ো। গয়না বেচে শোধ দেব।'

সরোজিনী শুনে হাসলেন, 'কথা শোন মেয়ের। বেশ তো অবিনাশ। সখ হয়েছে বৌমার, রাখুক না। তোর ষ্টুডিয়োতেও তো কত মূর্তি তুই নিজে সখ ক'রে রেখে দিয়েছিস। আর খদ্দের যদি আসেই, তা হলে না হয় বিক্রি করে দিবি, তাতে কি।'

রেবা মনে মনে বলল, 'হুঁ দিলেই হোল আর কি। একবার ঠাকুর ঘরে নিয়ে যেতে পারলে এ মূর্তি সেখান থেকে বার ক'রে আনবে সাধ্য কার। মা নিজেই আপত্তি করবেন তখন।'

অবিনাশ কি এক কাজে বাইরে গিয়েছে সরোজিনী মেঝের ওপর শীতলপাটি বিছিয়ে চৈতন্য-চরিতামৃত পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছেন, সেই ফাঁকে মণিরামের সাহায্যে মূর্তিটি একেবারে ঠাকুরঘরে নিয়ে বসিয়ে রাখল রেবা।

একেই সকাল থেকে অবিনাশের মেজাজ খারাপ হয়ে আছে, তারপর তার বিনা অনুমতিতে রেবা এই কাণ্ড করেছে দেখে তার ধৈর্য একেবারে লোপ পেল। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করল রেবাকে, সরোজিনীকেও কসুর করল না, আর মণিরামকে ঘাড় ধরে বের করে দিল বাড়ি থেকে।

রেবার চোখ ফেটে জল আসতে লাগল, আর সেই সঙ্গে বার বার মনে হ'তে লাগল রাগ করলে এত কুশ্রী দেখায় অবিনাশকে যে, তার দিকে একেবারেই চাওয়া যায় না।

সন্ধ্যার পর ক্রমেই অবশ্য মেজাজটা পড়ে এল অবিনাশের। পরিপাটি ভোজনের পর চিত্ত বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠল। সত্যি, এত কাণ্ড না করলেও চলত। মনে মনে বেশ লজ্জিতই হোল অবিনাশ। বিছানায় শুয়ে চুরুট টানতে টানতে মনে মনে অবিনাশ প্রতিজ্ঞা করল, মূর্তিশিল্প আর না, এবার থেকে জীবন-শিল্পের দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। মার কাছে আগেই ক্ষমা চেয়েছে। রেবা এলে তার কাছেও মার্জনা ভিক্ষা ক'রে বলবে, 'মূর্তিটা তোমাকে দিয়ে দিলুম।' এতদিন পড়ে শিল্পবোধ জেগেছে, তা হ'লে রেবার, শিল্পকে সে ভালবাসতে শিখেছে।

খাওয়া দাওয়া সেরে রেবা যখন ওপরে এল, অবিনাশ ততক্ষণে নাক ডাকা আরম্ভ করেছে। রেবা মুহূর্তকাল স্বামীর মুখের দিকে তাকাল। এতদিন ভালো ক'রে চেয়ে দেখেনি। আজ মনে হোল, ঘুমুলেও বড় বিশ্রী দেখা যায় অবিনাশের মুখ। প্রৌঢ় মুখে রুক্ষতার ছাপ পড়েছে। স্থানে স্থানে কুঁচকে গেছে চামড়া। এত অসুন্দর তার স্বামী আর সত্যিই এত বুড়ো। নিশ্চয়ই বয়স পাঁচ সাত বছর তাদের কাছে কমিয়ে বলেছিল। পঁয়তাল্লিশের একটা দিনও কম হবে না কিছুতে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে চোখ ফিরিয়ে নিতেই দেয়ালের বড় আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছায়া ভেসে উঠল রেবার। সত্যিই এত সুন্দর সে দেখতে! অপলকে রেবা কিছুক্ষণ আয়নার দিকে তাকিয়ে রইল। আর উগ্র আনন্দে অপূর্ব হাসি ফুটে উঠল তরে মুখে। তার যৌবন, তার সৌন্দর্য অবিনাশের কুশ্রী ব্যবহারের একমাত্র প্রতিশোধ।

জানালার ফাঁক দিয়ে ঘুমন্ত সহরতলী চোখে পড়ে। নারিকেল গাছ-

গুলোর মাথার ওপর গোল হয়ে উঠেছে চাঁদ। সমস্ত পৃথিবী জ্যোৎস্নায় ভেসে গেছে। এখানে অবিনাশের কোন অস্তিত্ব নেই, তার কথা অনায়াসে বিস্মৃত হওয়া যায়।

অপূর্ব আনন্দে সমস্ত মন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে রেবার। দেরাজ থেকে চাবি নিয়ে কাঁচের আলমারী খুলে একখানা স্কাই-ব্লু শাড়ি সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নিল রেবা। ড্রেসিং টেবিলের ওপর প্রসাধনের নানা টুকিটাকি আসবাব। কৌটো খুলে আঙুলের ডগায় ক্রীম নিয়ে সস্নেহে নিজের সুগৌর কপোলে বুলিয়ে দিল। দেশী বিদেশী নানা রঙের ফুলে ফুলদানীগুলি সাজিয়ে রেখেছে। তার ভেতর থেকে বেলকুঁড়ির মালাটা তুলে নিয়ে ঘনবদ্ধ কবরীতে রেবা জড়াতে লাগল।

পাশের ঘর থেকে সরোজিনী এই সময় ডেকে বললেন, 'বউমা, ঘুমিয়েছ?'

এক মুহূর্ত নিঃশ্বাস রোধ ক'রে রাখল রেবা, তারপর কম্পিত কণ্ঠে জবাব দিল, 'না।'

সরোজিনী বললেন, 'ঠাকুরঘর বোধ হয় খোলা রেখে এসেছ। রাতে বিরাতে কিছু একটা ঘরে ঢুকবে, যাও বন্ধ ক'রে এসো।'

মদনমোহনের প্রসন্ন সুন্দর মুখ হঠাৎ রেবার চোখের ওপর ভেসে উঠল, স্নিগ্ধকণ্ঠে জবাব দিল, 'যাই মা।'

খানিক পরে ঘুম ভাঙ্গল অবিনাশের। উজ্জ্বল আলোয় সমস্ত আসবাবপত্র সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কিন্তু বিছানা শূন্য, ঘরের কোথায়ও রেবা নেই। মনে মনে হেসে অবিনাশ বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। নিশ্চয়ই রেবা কোথাও বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে অভিমানে। আজ অবিনাশের মানভঞ্জনের পালা। নিঃশব্দে পা টিপে টিপে বেরোল অবিনাশ। হঠাৎ পিছন থেকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে চমকে দেবে রেবাকে।

তেমনি নিঃশব্দ পায়ে বাড়ির সবগুলি ঘর দেখতে দেখতে রেবাকে খুঁজে বেড়াল অবিনাশ। কিন্তু কোথাও রেবার দেখা মিলল না। হঠাৎ অবিনাশের চোখে পড়ল সরোজিনীর পূজার ঘর থেকে নীলাভ আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এত রাত্রে কে ওখানে? রেবা কি শেষ পর্যন্ত ঠাকুর-ঘরে ঢুকেছে। অবিনাশ নিঃশব্দে এগিয়ে গেল।

ভেজান দরজাটা আস্তে ঠেলে দিল অবিনাশ, তারপর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

নরম নীল আলোয় সমস্ত কক্ষটি অপূর্ব রহস্যময় হয়ে উঠেছে। মদনমোহনের গলায় দুলছে বেলকুঁড়ির মালা। আর তার সামনে আর একটি মর্মরমূর্তির মত রেবা দাঁড়িয়ে। মাথার আঁচল খসে পড়েছে মাটিতে। হাতের মোমবাতি থেকে গলিত মোম ঝরে ঝরে পড়ছে সেই আঁচলের ওপর।

'রেবা।'

অবিনাশের কণ্ঠ করুণ আর্তনাদের মত কক্ষময় প্রতিধ্বনিত হোল। চমকে উঠে মুখ ফিরাল রেবা। লজ্জায় শঙ্কায় অপূর্ব সুন্দর দুটি চোখ।

মালঞ্চ

মেল স্টিমারটা ছেড়ে যাওয়ার পর ঘণ্টা খানেক যেতে না যেতেই নদীর অন্য দিক থেকে আর একটি সিঁটির শব্দ ভেসে এল। যেন খানিক দূরে একটা বাঘা কুকুর গর্জে উঠেছে।

ষ্টীমার ঘাটা থেকে কয়েক গজের মধ্যেই ছোট বড় খান চারেক শণের ঘরে অস্থায়ী সরকারী হাসপাতাল। আগে নাম ছিল এফ, আর, ই—ফ্যামিন রিলিফ এমারজেন্সী। দুর্ভিক্ষপীড়িত, মুমূর্ষু স্থানীয় নিম্ন-শ্রেণীর সব স্ত্রী-পুরুষদের এখানে আশ্রয় আর চিকিৎসা মিলত। আজ-কাল মাস কয়েক হল নামটা পাল্টে রাখা হয়েছে সুজনগঞ্জ এ জি, অর্থাৎ অক্সিলিয়ারী গবর্নমেণ্ট হসপিটাল। এতে মর্যাদাটা কিছু বাড়লেও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ রয়েই গেছে।

ফিমেল ওয়ার্ডে বিভূতি একটি ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালিরিয়ার রোগিনীকে পরীক্ষা করছিল। পাশে দাঁড়িয়েছিল স্টাফ নার্স মালঞ্চ। সিঁটি শুনে সে কান খাড়া করল তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, 'ব্যাপার কি ডাক্তারবাবু।'

বিভূতি একবার চোখ তুলে তার দিকে তাকাল, বলল, 'বোধহয় সিভিল সার্জন। তাঁর লঞ্চের এইরকম শব্দ শুনেছি।'

মালঞ্চ বলল, 'সিভিল সার্জন; তাহলে আপনি এক্ষুনি ঘাটে যান ডাক্তারবাবু।'

বিভূতি ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলল, 'আমি কখন কি করব না করব সে

কি তোমাকে বলে দিতে হবে নার্স ?'

মালঞ্চ মুখ ম্লান ক'রে বলল, 'আজ্ঞে না, আমার অন্যায় হয়েছে।'

বিভূতি অপেক্ষাকৃত কোমল কণ্ঠে বলল, 'ডাক্তার নার্সের কাছে রোগীই সবচেয়ে বড়।'

এবার সেই কুকুরকণ্ঠী হর্ন আরও স্পষ্ট এবং আরও উচ্চতর হয়ে উঠল। সিভিল সার্জেনের মোটরলঞ্চ নিশ্চয়ই ঘাটের খুব কাছে এসে পড়েছে।

বিভূতি উঠে দাঁড়াল।

মালঞ্চ বলল, 'আচ্ছা ডাক্তার বাবু—।'

বিভূতি ফিরে তাকাল, 'বলো।'

মালঞ্চ একটু ইতস্তত করে বলল, 'আওয়াজটা কি সত্যিই হর্নের না ডাক্তার সাহেবের পোষা কুকুরের।'

বিভূতি সকৌতুকে হাসল। চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স হবে মালঞ্চের। কিন্তু এখনো ছেলেমানুষি কৌতূহল তার যায়নি। ওদের মত প্রাকৃত জনের বোধহয় কোন বয়সেই যায় না।

বিভূতি হেসে বলল, 'তোমার কি মনে হয়।'

মালঞ্চ বলল, 'আমার মনে হয় কি জানেন। সার্জেন সাহেবের কুকুরও ডাকে, হর্নও বাজে। অনেক দূর থেকে পাছে তাঁর কুকুরের ডাক শোনা না যায় তাই হর্নের শব্দটা কুকুরের মত করে নিয়েছেন! কুকুর নিশ্চয়ই খুব ভালোবাসেন ডাক্তার সাহেব।'

বিভূতি বলল, 'তা বোধ হয় বাসেন। তোমরা সব ঠিকঠাক থেকো। সিভিল সার্জন হয়তো এখনই আসতে পারেন।'

ফিকে হলদে রঙের মাঝারি আকারের লঞ্চখানা ততক্ষণে ঘাটে এসে ভিড়েছে। খালাসীরা বড় বড় দুটো তক্তা নামিয়ে দিয়েছে মাটিতে।

ধ'রে নামবার জন্য বাঁশের সরু লগি ছুটি খুঁটো পুঁতে তারা বেঁধে দিতে যাচ্ছিল, নন্দী সাহেব ভিতর থেকে বারণ করলেন, 'দরকার নেই।' তারপর লঞ্চের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

চল্লিশের ছু' এক বছর ওদিকেই হবে বয়স। গৌরবর্ণ দীর্ঘ চেহারা নিখুঁত সাহেবী বেশে তাঁকে চমৎকার মানিয়েছে।

সেলামে নমস্কারে যে সব অভিবাদন আসছিল স্মিতহাস্যে তার প্রত্যেকটির যথাযোগ্য অভিবাদন জানালেন নন্দী সাহেব। তারপর সেই তক্তার সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন পারে।

থানার ইনস্পেক্টার, কোর্টের মুন্সেফ, উকিল, ডাক্তার, স্থানীয় বণিক সমিতির প্রেসিডেণ্ট সেক্রেটারী—ছোট সহরের বড় বড় নাগরিকেরা অভ্যর্থনার জন্য মুহূর্তের মধ্যে সব এসে উপস্থিত হয়েছেন। সহকারী দেবেশের সঙ্গে হাসপাতালের ইনচার্জ বিভূতিকেও দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে।

মুন্সেফ বাবুই এগিয়ে এলেন প্রথমে, 'এমন ব্যাকওয়ার্ড জায়গা! কোনরকম যানবাহনের ব্যবস্থাই নেই। একটা সাইকেল রিক্সা পর্যন্ত এখানে মেলে না স্যার।'

নন্দী সাহেব হাসলেন, 'এই ছটাকখানেক জায়গায় যানবাহন আপনি চালাবেন কোথায় মুন্সেফবাবু। ওসবের জন্য ব্যস্ত হ'তে হবে না। কিছু কাল যাবৎ প্রায় জলচর হয়ে পড়লেও পায়ের ব্যবহার এখনো ভুলিনি।'

বিভূতির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তারপর বিভূতিবাবু, খবর সব ভালো? আপনার হাসপাতাল চলছে তো ঠিকমত?'

বিভূতি বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।'

নন্দী সাহেব বললেন, 'বেশ' তাহলে চলুন আগে হাসপাতালটাই দেখে আসা যাক আপনাদের। সামনের ঐ শনের ঘরগুলোই তো!'

পরিদর্শনটা কিছু অতর্কিত এবং বিনা বিজ্ঞাপিত।

বিভূতি বলল, 'আসুন।'

আর সবাইকে বিদায় দিলেন সিভিল সার্জন, বললেন, 'আপনাদের আর কষ্ট দেব না।' তারপর বিভূতিকে বললেন, 'চলুন।'

তিন চারখানা ছোট ছোট ঘর আর একখানা বড় আটচালায় জেনারেল ওয়ার্ড, বাঁশের বাখারির বেড়ায় পাঁচ ছ'টি খোপে ভাগ করা হয়েছে। কোনটিতে আউটডোরের রোগীদের দেখা হয়। কোনটি সুপারিনটেণ্ডেণ্টের খাস কামরা।

আসবাবপত্রের নামগুলি ইংরাজী কিন্তু জিনিষগুলির অধিকাংশই একেবারে খাঁটী স্থানীয় সংস্করণ। মুলি বাঁশের বাঁখারি বেঁধে তৈরী করা হয়েছে মশারির স্টাণ্ড। ডোরাকাটা জোলাকী থান কাপড়ের ছোট ছোট উটমুখো সব মশারি। বাঁশের আর বাজে কাঠের তৈরী স্থানীয় ছুতারের গড়া টেবিল। সবগুলি পা ঠিক সমানভাবে দাঁড়ায় না সিভিল সার্জন দেখেন আর মুখ মুচকে হাসেন। নার্সরা এরই মধ্যে হঠাৎ ভারি ব্যস্ত এবং কর্মতৎপর হয়ে উঠেছে। নন্দী সাহেব সকৌতুকে একবার তাদের দিকে তাকালেন, অল্প বয়সী, আধা বয়সী নিম্ন শ্রেণীর সব স্ত্রীলোক। রঙ প্রায় প্রত্যেকটিরই ঘন কালো। হাত পায়ের গড়নে কি মুখে চোখে তেমন কোনো শ্রী ছাঁদ নেই। বরং অশিক্ষার একটা পুরু ছাপ আছে।

নন্দী সাহেব বিভূতিকে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এসব আমদানী করলেন কোত্থেকে। একেবারে ফরমায়েস দেওয়া মনে হচ্ছে।'

বিভূতি বলল, 'এখানকারই সব নমঃশূদ্র আর চাষী কৈবর্তদের মেয়ে। লোকাল রিক্রুটমেণ্টে সরকারের খরচও কম পড়ে আর এসব দুঃস্থ পরিবারেরও কিছুটা সুরাহা হয়।'

নন্দী সাহেব বললেন, 'তাতো হয়, কিন্তু নার্সিং কি ঠিকমত ওদের দিয়ে চলে? ওদের হাতে ওষুধপথ্য খেতে রোগীদের কি প্রবৃত্তি হয়?'

বিভূতি বলল, 'প্রবৃত্তি হবে না কেন স্যার। ওদের মা বোনের মুখ হাতওতো ওই রকমই। আর নার্সিং সম্বন্ধে মোটামুটি আমি শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছি। এখনো সপ্তাহে দু'তিনদিন আমি ওদের ক্লাস নিই, আমার স্ত্রীও ওদের মোটামুটি সাধারণ লেখা-পড়াটা শিখাবার চেষ্টা করছেন।'

নন্দী সাহেব বললেন, 'বটে, তাহলে আপনারা দু'জনে মিলে ওদের একেবারে মানুষ না করে ছাড়বেন না দেখছি।'

তারপর নন্দী সাহেব মাঝ বয়সী একটি নার্সকে হাতের ইসারায় ডেকে আনলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, 'নাম কি তোমার?'

নার্সটি কম্পিত গলায় জবাব দিল, 'হরিদাসী।'

'ডিউটিতে আসবার সময় দাঁতে মিশি দিতে হয় না একথা ডাক্তার-বাবুরা তোমাদের বলে দেননি?'

সহকারী দেবেশ বলল, 'অন্ততপক্ষে হাজার বার বলেছি স্যার—'

'হাজার বার বলার পরেও যখন এই অবস্থা তখন উপযুক্ত স্টেপ নেননি কেন?' নন্দী সাহেব বিভূতির দিকে তাকালেন।

বিভূতি বলল, 'আজ্ঞে ক্রমে ক্রমে এসব অভ্যাস ছাড়াবার চেষ্টা করছি। কজন ছেড়েও দিয়েছে। জনকয়েক কেবল এখনও পারেনি। মিশি ব্যবহার না করলে নাকি ওদের মাথা ঘোরে, বমি হয়, কিছুতেই ভালো করে ডিউটি দিতে পারে না।'

নন্দী সাহেব ভ্রূকুটি করলেন, 'হুঁ, আমি তা'হলে ঠিকই শুনেছিলাম, ওরা কিছু বেশি Indulgence-ই পাচ্ছে।'

বিভূতি প্রতিবাদ করে বলল, 'না স্যার, আপনি ভুল শুনেছেন, এদের

নিয়ে যে কষ্টে—'

নন্দী সাহেব গূঢ় ব্যঞ্জনায় হাসলেন, 'আমরাও তাই ঠিক করেছি। এত কষ্টের আর কোন মানে হয় না আপনাদের।'

এরপর আরো দু'একটি ওয়ার্ড পরিদর্শন করলেন নন্দীসাহেব। সর্ব্বত্রই তিনি খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগলেন। কোথাও রোগীদের ওষুধপথ্য ঠিকমত খাওয়ানো হচ্ছে না, কোথাও মশারি যেমন তেমনভাবে টাঙানো হয়েছে, ভিতর দিয়ে মশা যাচ্ছে, কোন কোন রোগীর বিছানাপত্র অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন। নন্দী সাহেবের মুখ ক্রমেই গম্ভীর এবং অপ্রসন্ন হয়ে উঠতে লাগল।

ফিমেল ওয়ার্ডে মালঞ্চ অন্য সব নার্সদের কাজকর্ম দেখিয়ে দিয়ে একটা বাঁশের টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে পেনসিল দিয়ে খাতায় কি টুকে নিচ্ছিল। লেখার দ্রুততায় হালকা টেবিলটা কাঁপছিল ঠক ঠক করে। নন্দীসাহেব এসে ঘরে ঢুকলেন। তাড়াতাড়ি খাতা পেনসিল রেখে নমস্কার জানাল মালঞ্চ।

নন্দী সাহেব পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালেন একবার। এতক্ষণ পরে এই একটি মাত্র নার্স তার চোখে পড়ল যার দিকে চাইলে চোখ পীড়িত না হয়ে প্রসন্ন হয়। রঙ এর কালো পাথরের মত কিন্তু নাক চোখ যেন কোন নিপুণ হাতে পাথর কুঁদে বার করা। নন্দী সাহেব বিভূতিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটি কে?'

বিভূতি বলল, 'মালঞ্চ। আমাদের স্টাফ নার্স।'

নন্দী সাহেব বললেন, 'এও কি—'

বিভূতি ইংরাজীতে জবাব দিল 'হ্যাঁ, এও ঐ চাষী কৈবর্তের মেয়ে। তবে ওদের বংশে কিছু লেখাপড়ার চর্চা ছিল। তা ছাড়া মেয়েটি বেশ চালাক চতুরও।'

নন্দী সাহেব মৃদু হাসলেন, 'হ্যাঁ, সেটা মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।'

বিভূতি বলল, 'তাছাড়া পড়াশুনোয় অমনিতেও খুব ঝোঁক। আমার স্ত্রীর কাছে নিয়মিত একবার করে যায় পড়া দেখিয়ে নিতে।'

নন্দী সাহেব আবার একটু মৃদু হাসলেন,

'Publicity-র জন্য আপনি তাঁর কাছ থেকে কত পান বিভূতিবাবু?'

বিভূতি বলল, 'কার কাছ থেকে?'

নন্দী সাহেব বললেন, 'I mean your wife'

সহকারী দেবেশ এমন কি নার্সরাও হাসি গোপনের চেষ্টা করল, ডাক্তারী শব্দ ছাড়াও এ ধরনের দু'একটা ইংরাজী কথা এরা বুঝতে শিখেছে এবং দেশীয় রীতিতে বিদেশীয় শব্দ গুলির নির্ভুল উচ্চারণও আয়ত্ত করে ফেলেছে।

এরপর মালঞ্চকে নার্সিং সংক্রান্ত দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করলেন নন্দী সাহেব। দু'একটি রোগীকে এক আধটু পরীক্ষা করলেন। সেই ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার কেসটি ছাড়া কঠিন কোন কেস নেই বললেই চলে। প্রায়ই সাধারণ ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশা আর দু' একটা টাই-ফয়েড রোগীর সংখ্যা খুব বেশি নয় বর্তমানে।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে নন্দী সাহেব ফের লঞ্চের দিকে যেতে যেতে বললেন, 'খাতাপত্র আমার লঞ্চেই পাঠিয়ে দেবেন বিভূতিবাবু, সেখানেই দেখব। আর কাল ভোরে দেবেশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন আমার লঞ্চে। কথাবার্তা বলা যাবে।'

আমন্ত্রণ এল অনেকের কাছ থেকেই, মুনসেফবাবু, দারোগাবাবু, বিভূতি স্বয়ং প্রত্যেকেই নন্দী সাহেবকে নিজের বাসায় নেওয়ার জন্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি সবাইকেই স্মিত হাস্যে ফিরিয়ে দিলেন, কাল তিনি সবাইর অনুরোধই রাখবেন। এসেছেন যখন, জায়গাটা একটু ঘুরেটুরে

দেখবার তাঁর নিজেরই খুব ইচ্ছা আছে। কিন্তু আজ নয়। আজ তিনি অত্যন্ত শ্রান্ত। রাতটুকু তাঁর বিশ্রামের দরকার। খাওয়া দাওয়া? চাকর আর বাবুর্চিরাই সে ব্যবস্থা করবে। সেজন্য কাউকে ভাবতে হবে না, তবে তাঁরা যেন ফর্দমাফিক বাজারের ব্যবস্থাটা করে দেন। তাঁর চাকরের পক্ষে হয়তো অসুবিধা হবে। জায়গাটা তার পক্ষে নতুন।

যদিও বিশেষ কিছু নয়, ঘি, ডিম, গোলআলু, গোটাতিনেক মুরগী, সরু চাল এমনি আরও কয়েকটি নিতান্ত সাধারণ খাদ্যবস্তু। রাতের মত এতেই চলবে। কিন্তু এখানে রাত্রে বাজার মেলে না হাটবার ছাড়া সন্ধ্যার পর সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। তবু দোকানে যারা ঘুমায় তাদের ডাকাডাকি করে ঝাঁপ খুলিয়ে কিছু কিছু জিনিষ সংগ্রহ করল বিভূতি আর দেবেশ। কিন্তু মুরগীও মিলল না ডিমও মিলল না।

সিভিল সার্জনের চাকর বলল, 'কিন্তু ওসব ছাড়া তো সাহেবের এক-বেলাও চলে না, অন্তত দুটোর একটা তো চাই-ই।'

বিভূতি বলল, 'আচ্ছা তোমরা যাও, জিনিসগুলি যেভাবেই হোক জোগাড় করে আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

নন্দী সাহেবের মন্তব্যগুলির কথা ভেবে রাত্রে শুয়ে শুয়ে বিভূতি মনে মনে হাসল। সবরকম দৈন্য, সব মালিন্যই দূর করতে জানে বিভূতি। কেবল ঠিকমত সময়ের অপেক্ষায় আছে। মহৎ কাজের জন্য ধৈর্যের দরকার, সহিষ্ণুতার দরকার। রূঢ় কথায়, চোখ রাঙিয়ে রাতারাতি মানুষকে যেটুকু শোধরান যায় তা পরের রাত পর্যন্ত টেকে না—এইই বিভূতির বিশ্বাস। যে কোন কাজকর্মে, কিংবা যে কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিজের অত্যন্ত মন্থরতাকে এমনি করেই বিভূতি সমর্থন করে। খুব বেশী রাগ বিভূতি কারো ওপরই করতে পারে না। তাই রাগ করাটাকে অশোভন অসুন্দর অভদ্রোচিত বলে ভাবে। ফলে

মনকে সে যতই নির্মল রাখুক—চারদিকে মালিন্য জমতে দেরী হয় না। যে কাজের ভার সে নেয় সে কাজে গলদ দেখা যায়। অধস্তন যাদের ওপর সে নির্ভর করে তারা তাকে ভয় করে না। বিভূতি বলে, ভয় না করুক তারা আমাকে ভালো তো বাসে।'

তা অবশ্য বাসে। কিন্তু আড়ালে গিয়ে মুখ টিপে টিপে তারা আবার হাসেও।

ডিম আর মুরগীর ভেট যথাসময়েই পাঠান হোল। তবু পরদিন ভোরে লঞ্চে বিভূতিকে ডেকে সিভিল সার্জন একে একে নানারকম অভিযোগের কথা শোনালেন। বিভূতির পরিচালনায় হাসপাতালে ভয়ঙ্কর অব্যবস্থা এবং বিশৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে আসবাবপত্র উধাও হচ্ছে। কাছাকাছি গ্রামগুলিতে নিম্নশ্রেণীর বউ-ঝিরা যে সব খাটো খাটো ডুরে শাড়ি পরে রয়েছে তার অধিকাংশই নাকি হাসপাতালের মশারি থেকে তৈরী। রোগীদের চিকিৎসা এবং সেবাযত্ন আশানুরূপ হচ্ছে না কারণ সরকারী ওষুধ লোক বুঝে সহরের ঘরে ঘরে বিক্রি এবং উপহৃত হচ্ছে আর নার্স'রা সুস্থ মানুষদের নিয়ে এত ব্যস্ত রয়েছে যে, অসুস্থদের ওপর মনোযোগ দেওয়ার সময় করে উঠতে পারছে না।

বিভূতি শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল, 'কিন্তু এসব কি আপনি বিশ্বাস্য বলে মনে করেন?' সিভিল সার্জন একটু হাসলেন, 'আমার বিশ্বাস করা না করার কথা তো হচ্ছে না, বিভূতিবাবু। অভিযোগগুলি এখানকার হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। আর হাসপাতালে যে কিছুটা সুবন্দোবস্তের অভাব ঘটেছে তা তো নিজের চোখেই দেখলাম

বিভূতি এবারেও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল, 'বেশ, হাসপাতালের চার্জ তাহলে আর কারো ওপরে দিন।'

সিভিল সার্জন আবার প্রশান্তভাবে একটু হাসলেন। 'এ আপনার

রাগের কথা, অভিমানের কথা বিভূতিবাবু।'

তাঁর কথা বলবার মধুর ভঙ্গি দেখে মনে করা শক্ত যে তিনি বিভূতির ওপরওয়ালা হর্তাকর্তা, কতকগুলি গুরুতর অভিযোগ এইমাত্র তিনি বিভূতির বিরুদ্ধে উপস্থিত করেছেন।

সিভিল সার্জন আবার বললেন, 'চার্জ নেওয়ার মত আপনার চেয়ে যোগ্যতর লোক যে এখানে নেই তা আমরা জানি। অন্য লোককে চার্জ দিলেই কি এখানকার হাওয়া ফিরবে আপনি ভাবেন। তা নয়, সমস্যার সমাধান ওভাবে হবে না। হাসপাতালটাই এখান থেকে আমরা তুলে নিতে চাইছি।'

'তুলে নেবেন!' মৃদু আর্তনাদের মত শোনাল বিভূতির গলা।

সিভিল সার্জন একটু যেন বিস্মিত হলেন, বললেন, 'হ্যাঁ। এখানে গভর্ণমেণ্টের খরচ পোষাচ্ছে না সেই হচ্ছে আসল কারণ বুঝেছেন? অবশ্য একেবারে abolish করা হবে না; Subdivsional town এর সঙ্গে এটা amalgamated হয়ে যাবে। এখানকার কিছু staff সেখানে transfer করলেই চলবে। আপনি সেখানে কিংবা আমাদের অন্য কোন হাসপাতালে যেতে পারেন। Qualified man ইচ্ছা করলে ফের private practice করতে পারেন আপনি। শুনেছি এতকাল তো তাই করছিলেন।' সিভিলসার্জ্জন একটু হাসলেন।

শেষ কথাটি বিভূতির কানে গেল কিনা বোঝা গেল না। বিভূতি বলল, 'কিন্তু এখানকার লোক তো যথেষ্ট suffer করবে। কাছে ধারে কোন রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, ভালো কোন ডাক্তার কবিরাজ নেই, আর থাকলও পয়সা দিয়ে ওষুধ কিনে খাবার ক্ষমতা ওদের মধ্যে ক'জনের আছে। এই হাসপাতাল খোলার ফলে স্থানীয় অনেক স্ত্রী-পুরুষকে Provide করা হয়েছিল। এই দুর্দিনে তারা হঠাৎ বেকার হয়ে পড়বে।

এখানকার কয়েকটি নার্সের আয়ে মা বাপ ভাই বোন, ভাইপো, ভাইঝির এক একটা বড় বড় সংসার চলছে—আমি খোঁজ নিয়েছি। হঠাৎ এরা বেকার হয়ে পড়লে সেই সব family-র দুর্দশার শেষ থাকবে না। কথাটা একবার দয়া করে ভেবে দেখুন।'

নন্দী সাহেব বললেন, 'সবই তো বুঝি বিভূতিবাবু। কিন্তু আমাদের ভেবে দেখায় কিছু কি এসে যায়? ভেবে আমরা কিছুই দেখতে পাই না, যা দেখি তাতে আবার ভাববার ক্ষমতা থাকে না। বাংলা দেশে সুজনগঞ্জ কি একটা? ভেবে আপনি কি করতে পারেন বলুন।'

না, অন্ততঃ এই সিভিল সার্জনের কাছে সে যে কিছু করে উঠতে পারবে না সে সম্বন্ধে বিভূতি প্রায় নিঃসংশয় হয়েছে। ক্ষুব্ধ উদ্বিগ্ন মনে বিভূতি বাসার দিকে চলল।

রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে মালঞ্চ তরকারী কুটে দিচ্ছিল। একরকম টুকটাক কাজ অন্যান্য নার্সরা তো করেই মালঞ্চ নিজেও এসে একএক দিন হাত দেয়, আজ কিন্তু মীনা নিষেধ করেছিল, 'দরকার নেই তোমার তরকারী কোটায়। আমি একাই করে নিতে পারব। তোমাদের সিভিল সার্জন এসেছেন। হাসপাতালে তোমাকে দেখতে না পেয়ে খুঁজে খুঁজে হয়তো এখানেই এসে পড়বেন। তার চেয়ে যার যার কাজ-কর্ম করো গিয়ে সে-ই ভালো।'

মালঞ্চ জবাব দিয়েছিল, 'কাজকর্ম মানে তো সেই রোগী নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি তা কি আর সব সময় ভালো লাগে দিদিমণি? আমরাও গেরস্ত ঘরের মেয়ে। তাছাড়া আমার ডিউটি সেরে আমি এসেছি, আপনি ভাববেন না।' তারপর একটু থেমে মৃদু হেসে মালঞ্চ বলেছিল, 'আর আমাকে খুঁজে খুঁজে ডাক্তার সাহেব যদি এখানে এসেই পড়েন তাতে তাঁর লাভ বই লোকসান হবে না।

শাসনের ভঙ্গিতে মীনা ভ্রূ কুঁচকালো। ঠোঁট দুটি উঠল শক্ত হয়ে। বলল, 'কি সব বাজে বকছ মালঞ্চ।'

ধমক খেয়ে মালঞ্চের ঠোঁট ঠিক শক্ত নয়, যেন একটু স্ফীত হ'তে চাইল। নীচু হয়ে তাড়াতাড়ি তরকারী কোটায় মন দিল মালঞ্চ। এদের কাছে মান অভিমানের কোন দাম নেই। এরা এক মুহূর্তে যতটুকু কাছে টানে পরের মুহূর্তে তার চেয়ে অনেক বেশী ঠেলে দূরে। দিদিমণিও তাই ডাক্তার বাবুও তাই। তবু দূরে সরে থাকতে পারে না মালঞ্চ। তাকে ফিরে ফিরে আসতেই হয়। এদের গায়ের গন্ধটুকুও যেন তাকে আকর্ষণ করে, ঘরের হাওয়া টানে মনকে। মালঞ্চের চোখে ভালো লাগে মীনার শাড়িপরার বিশেষ ধরন, চুল বাঁধবার ছাঁদ, তার রান্না করতে করতে ছেলে পড়ানো। মালঞ্চের চোখে ভালো লাগে কথায় কথায় ডাক্তারবাবুর অন্যমনস্ক হয়ে পড়া, ঘর-সংসারের সম্বন্ধে গভীর ঔদাসিন্য, হাসপাতালের কাজে, রোগের চিকিৎসায় একেবারে মগ্ন হয়ে যাওয়া। তখন ভারি অদ্ভুত দেখায় ডাক্তারবাবুকে। যেন এক রহস্যময় দামী মার্বেল পাথরের মূর্তি। তার চারিদিকটা নিষেধের বেড়ায় ঘেরা। তবু সেই বেড়া ডিঙ্গাতে লোভ হয়, ইচ্ছা হয় তাকে একবার ছুঁয়ে দেখতে; যত ভয়, যত সংশয়, যত শাসনই থাক না কেন। এমনি একটি মূর্তি দেখেছিল সেবারে মালঞ্চ কাঞ্চনপুরের জমিদার বাড়িতে যাত্রা শুনতে গিয়ে। সে মূর্তিকে ছুঁয়ে দেখতে পারেনি, কিন্তু যন্ত্রপাতি, সাবান, তোয়ালে এগিয়ে দিতে গিয়ে এ মূর্তিকে তো কতবার কত ছলে ছুঁয়েছে। কিন্তু একজনের ছোঁয়ায় লাভ কি. ছোঁয়াছুঁয়ি যদি না হয়? আঙুলের ছোঁয়া কি পৌছায় পাথরের মধ্যে।

বিভূতির গলার আওয়াজে মালঞ্চের চমক ভাঙল। 'রান্নাবান্না তোমার হোল মীনা? একবার এঘরে এসতো একটু।'

এখানকার কয়েকটি নার্সের আয়ে মা বাপ ভাই বোন, ভাইপো, ভাইঝির এক একটা বড় বড় সংসার চলছে—আমি খোঁজ নিয়েছি। হঠাৎ এরা বেকার হয়ে পড়লে সেই সব family-র দুর্দশার শেষ থাকবে না। কথাটা একবার দয়া করে ভেবে দেখুন।'

নন্দী সাহেব বললেন, 'সবই তো বুঝি বিভূতিবাবু। কিন্তু আমাদের ভেবে দেখায় কিছু কি এসে যায়? ভেবে আমরা কিছুই দেখতে পাই না, যা দেখি তাতে আবার ভাববার ক্ষমতা থাকে না। বাংলা দেশে সুজনগঞ্জ কি একটা? ভেবে আপনি কি করতে পারেন বলুন।'

না, অন্ততঃ এই সিভিল সার্জনের কাছে সে যে কিছু করে উঠতে পারবে না সে সম্বন্ধে বিভূতি প্রায় নিঃসংশয় হয়েছে। ক্ষুব্ধ উদ্বিগ্ন মনে বিভূতি বাসার দিকে চলল।

রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে মালঞ্চ তরকারী কুটে দিচ্ছিল। একরকম টুকটাক কাজ অন্যান্য নার্সরা তো করেই মালঞ্চ নিজেও এসে একএক দিন হাত দেয়, আজ কিন্তু মীনা নিষেধ করেছিল, 'দরকার নেই তোমার তরকারী কোটায়। আমি একাই করে নিতে পারব। তোমাদের সিভিল সার্জন এসেছেন। হাসপাতালে তোমাকে দেখতে না পেয়ে খুঁজে খুঁজে হয়তো এখানেই এসে পড়বেন। তার চেয়ে যার যার কাজ-কর্ম করো গিয়ে সে-ই ভালো।'

মালঞ্চ জবাব দিয়েছিল, 'কাজকর্ম মানে তো সেই রোগী নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি তা কি আর সব সময় ভালো লাগে দিদিমণি? আমরাও গেরস্ত ঘরের মেয়ে। তাছাড়া আমার ডিউটি সেরে আমি এসেছি, আপনি ভাববেন না।' তারপর একটু থেমে মৃদু হেসে মালঞ্চ বলেছিল, 'আর আমাকে খুঁজে খুঁজে ডাক্তার সাহেব যদি এখানে এসেই পড়েন তাতে তাঁর লাভ বই লোকসান হবে না।

শাসনের ভঙ্গিতে মীনা ভ্রূ কুঁচকালো। ঠোঁট দুটি উঠল শক্ত হয়ে। বলল, 'কি সব বাজে বকছ মালঞ্চ।'

ধমক খেয়ে মালঞ্চের ঠোঁট ঠিক শক্ত নয়, যেন একটু স্ফীত হ'তে চাইল। নীচু হয়ে তাড়াতাড়ি তরকারী কোটায় মন দিল মালঞ্চ। এদের কাছে মান অভিমানের কোন দাম নেই। এরা এক মুহূর্তে যতটুকু কাছে টানে পরের মুহূর্তে তার চেয়ে অনেক বেশী ঠেলে দূরে। দিদিমণিও তাই ডাক্তার বাবুও তাই। তবু দূরে সরে থাকতে পারে না মালঞ্চ। তাকে ফিরে ফিরে আসতেই হয়। এদের গায়ের গন্ধটুকুও যেন তাকে আকর্ষণ করে, ঘরের হাওয়া টানে মনকে। মালঞ্চের চোখে ভালো লাগে মীনার শাড়িপরার বিশেষ ধরন, চুল বাঁধবার ছাঁদ, তার রান্না করতে করতে ছেলে পড়ানো। মালঞ্চের চোখে ভালো লাগে কথায় কথায় ডাক্তারবাবুর অন্যমনস্ক হয়ে পড়া, ঘর-সংসারের সম্বন্ধে গভীর ঔদাসিন্য, হাসপাতালের কাজে, রোগের চিকিৎসায় একেবারে মগ্ন হয়ে যাওয়া। তখন ভারি অদ্ভুত দেখায় ডাক্তারবাবুকে। যেন এক রহস্যময় দামী মার্বেল পাথরের মূর্তি। তার চারিদিকটা নিষেধের বেড়ায় ঘেরা। তবু সেই বেড়া ডিঙ্গাতে লোভ হয়, ইচ্ছা হয় তাকে একবার ছুঁয়ে দেখতে; যত ভয়, যত সংশয়, যত শাসনই থাক না কেন। এমনি একটি মূর্তি দেখেছিল সেবারে মালঞ্চ কাঞ্চনপুরের জমিদার বাড়িতে যাত্রা শুনতে গিয়ে। সে মূর্তিকে ছুঁয়ে দেখতে পারেনি, কিন্তু যন্ত্রপাতি, সাবান, তোয়ালে এগিয়ে দিতে গিয়ে এ মূর্তিকে তো কতবার কত ছলে ছুঁয়েছে। কিন্তু একজনের ছোঁয়ায় লাভ কি. ছোঁয়াছুঁয়ি যদি না হয়? আঙুলের ছোঁয়া কি পৌঁছায় পাথরের মধ্যে।

বিভূতির গলার আওয়াজে মালঞ্চের চমক ভাঙল। 'রান্নাবান্না তোমার হোল মীনা? একবার এঘরে এসতো একটু।'

এখানকার কয়েকটি নার্সের আয়ে মা বাপ ভাই বোন, ভাইপো, ভাইঝির এক একটা বড় বড় সংসার চলছে—আমি খোঁজ নিয়েছি। হঠাৎ এরা বেকার হয়ে পড়লে সেই সব family-র দুর্দশার শেষ থাকবে না। কথাটা একবার দয়া করে ভেবে দেখুন।'

নন্দী সাহেব বললেন, 'সবই তো বুঝি বিভূতিবাবু। কিন্তু আমাদের ভেবে দেখায় কিছু কি এসে যায়? ভেবে আমরা কিছুই দেখতে পাই না, যা দেখি তাতে আবার ভাববার ক্ষমতা থাকে না। বাংলা দেশে সুজনগঞ্জ কি একটা? ভেবে আপনি কি করতে পারেন বলুন।'

না, অন্ততঃ এই সিভিল সার্জনের কাছে সে যে কিছু করে উঠতে পারবে না সে সম্বন্ধে বিভূতি প্রায় নিঃসংশয় হয়েছে। ক্ষুব্ধ উদ্বিগ্ন মনে বিভূতি বাসার দিকে চলল।

রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে মালঞ্চ তরকারী কুটে দিচ্ছিল। একরকম টুকটাক কাজ অন্যান্য নার্সরা তো করেই মালঞ্চ নিজেও এসে একএক দিন হাত দেয়, আজ কিন্তু মীনা নিষেধ করেছিল, 'দরকার নেই তোমার তরকারী কোটায়। আমি একাই করে নিতে পারব। তোমাদের সিভিল সার্জন এসেছেন। হাসপাতালে তোমাকে দেখতে না পেয়ে খুঁজে খুঁজে হয়তো এখানেই এসে পড়বেন। তার চেয়ে যার যার কাজ-কর্ম করো গিয়ে সে-ই ভালো।'

মালঞ্চ জবাব দিয়েছিল, 'কাজকর্ম মানে তো সেই রোগী নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি তা কি আর সব সময় ভালো লাগে দিদিমণি? আমরাও গেরস্ত ঘরের মেয়ে। তাছাড়া আমার ডিউটি সেরে আমি এসেছি, আপনি ভাববেন না।' তারপর একটু থেমে মৃদু হেসে মালঞ্চ বলেছিল, 'আর আমাকে খুঁজে খুঁজে ডাক্তার সাহেব যদি এখানে এসেই পড়েন তাতে তাঁর লাভ বই লোকসান হবে না।

শাসনের ভঙ্গিতে মীনা ভ্রূ কুঁচকালো। ঠোঁট দুটি উঠল শক্ত হয়ে। বলল, 'কি সব বাজে বকছ মালঞ্চ।'

ধমক খেয়ে মালঞ্চের ঠোঁট ঠিক শক্ত নয়, যেন একটু স্ফীত হ'তে চাইল। নীচু হয়ে তাড়াতাড়ি তরকারী কোটায় মন দিল মালঞ্চ। এদের কাছে মান অভিমানের কোন দাম নেই। এরা এক মুহূর্তে যতটুকু কাছে টানে পরের মুহূর্তে তার চেয়ে অনেক বেশী ঠেলে দূরে। দিদিমণিও তাই ডাক্তার বাবুও তাই। তবু দূরে সরে থাকতে পারে না মালঞ্চ। তাকে ফিরে ফিরে আসতেই হয়। এদের গায়ের গন্ধটুকুও যেন তাকে আকর্ষণ করে, ঘরের হাওয়া টানে মনকে। মালঞ্চের চোখে ভালো লাগে মীনার শাড়িপরার বিশেষ ধরন, চুল বাঁধবার ছাঁদ, তার রান্না করতে করতে ছেলে পড়ানো। মালঞ্চের চোখে ভালো লাগে কথায় কথায় ডাক্তারবাবুর অন্যমনস্ক হয়ে পড়া, ঘর-সংসারের সম্বন্ধে গভীর ঔদাসিন্য, হাসপাতালের কাজে, রোগের চিকিৎসায় একেবারে মগ্ন হয়ে যাওয়া। তখন ভারি অদ্ভুত দেখায় ডাক্তারবাবুকে। যেন এক রহস্যময় দামী মার্বেল পাথরের মূর্তি। তার চারিদিকটা নিষেধের বেড়ায় ঘেরা। তবু সেই বেড়া ডিঙ্গাতে লোভ হয়, ইচ্ছা হয় তাকে একবার ছুঁয়ে দেখতে; যত ভয়, যত সংশয়, যত শাসনই থাক না কেন। এমনি একটি মূর্তি দেখেছিল সেবারে মালঞ্চ কাঞ্চনপুরের জমিদার বাড়িতে যাত্রা শুনতে গিয়ে। সে মূর্তিকে ছুঁয়ে দেখতে পারেনি, কিন্তু যন্ত্রপাতি, সাবান, তোয়ালে এগিয়ে দিতে গিয়ে এ মূর্তিকে তো কতবার কত ছলে ছুঁয়েছে। কিন্তু একজনের ছোঁয়ায় লাভ কি. ছোঁয়াছুঁয়ি যদি না হয়? আঙুলের ছোঁয়া কি পৌঁছায় পাথরের মধ্যে।

বিভূতির গলার আওয়াজে মালঞ্চের চমক ভাঙল। 'রান্নাবান্না তোমার হোল মীনা? একবার এঘরে এসতো একটু।'

হাতের কাজ ফেলে মীনা চলে গেল ওঘরে আর বঁটিতে বেগুন ঠেকিয়ে মালঞ্চ রইল উৎকর্ণ হয়ে। স্বামীস্ত্রীর কথাবার্তার যতটুকু কানে গেল তাতে আসল ব্যাপারটা বুঝতে তার বাকি রইল না। সরকারি হাসপাতালটা উঠে যাচ্ছে এখান থেকে, আর সেইজন্যই সিভিল সার্জন সাহেব এবার এসেছেন। ধক করে উঠল মালঞ্চের বুকের মধ্যে। প্রথম প্রথম কতদিন এই হাসপাতালের ঘরগুলি নিজের হাতে ঝাট দিয়েছে মালঞ্চ, ন্যাতা দিয়ে নিকিয়েছে সযত্নে; নিজের বাড়ির লোকের মত রোগীদের সেবা করেছে তাদের নোংরা অপরিচ্ছন্ন বিছানা পরিস্কার করেছে আপন হাতে। সেই হাসপাতাল এখান থেকে মুখের কথায় তুলে নিচ্ছে তারা; একটু দয়ামায়া নেই শরীরে; একটু বিচার বিবেচনা নেই মনে। মীনার শেষ কথাটি কানে গেল মালঞ্চের। 'অবশ্য শেষের দিকটায় ইদানিং আমরা এখানে বেশ আরাম আর শান্তিতেই ছিলাম। তবু হাসপাতাল যদি ওরা নাই রাখে না রাখবে, অত ভাবছ কেন তুমি, কোথাও না কোথাও তোমাকে ওরা বদলি তো করবেই, আর তাও যদি না হয় তাতেই বা কি। হাসপাতালের বাইরেও তো রোগীপত্তর আছে আর তোমার বিদ্যাও কেউ কেড়ে নেয়নি।'

ভিতরে ভিতরে জ্বলে উঠল মালঞ্চ। ঠিকই বলেছে ডাক্তারবাবুর স্ত্রী। ওরা যতই এখানকার লোকের সঙ্গে মিশুক আপন বলে ভাবুক আর আপন বলুক তাদের, এরা যে পর সেই পর। বিদেশী মানুষ, চাকরী করতে এসেছে। এখানকার চাকরী গেলে অন্য কোথাও গিয়ে চাকরী খুঁজবে। হাসপাতালের ভালোমন্দে ওদের কি এসে যায়। এখানকার লোকের মত ওদের তত বাজবে কেন। বিভূতির বিরুদ্ধেও অকস্মাৎ অভিমান আর আক্রোশে পূর্ণ হয়ে উঠল মালঞ্চের মন। ডাক্তারবাবু তাদের কেউ নন। মিথ্যাই সে তাঁকে এতদিন আপন মনে করে এসেছে

দেবতা মনে ক'রে এসেছে।

তরকারী কোটা ফেলে রেখে মালঞ্চ বেড়িয়ে এল বিভূতির বাড়ী থেকে। এল হাসপাতালে। নার্সদের বলল, রোগীদের বলল, মেথর ঝাড়ুদার কাউকে জানাতেই বাকি রাখল না যে, এখানকার হাসপাতাল সরকার তুলে নিচ্ছেন। রাত পোহাতে না পোহাতে এতগুলি মেয়ে-পুরুষের মুখ থেকে অন্ন চলে যাবে, এতগুলি রোগীর মুখে ওষুধ পড়বে না।

নার্সরা ঘিরে ধরল, ছোটরা বলল, 'উপায় কি দিদি।' বড়রা পরামর্শ দিল 'উপায় একটা কিছু বার করতেই হবে মালঞ্চ। আয় সবাই মিলে ডাক্তারবাবুকে ধরি।'

আগুনের মত জ্বলে উঠল মালঞ্চ, জবাব দিল, 'ছাই করবে ডাক্তারবাবু।

ছোট বড় সবাই শিউরে উঠল, 'ছিছি, মালঞ্চ দেবতাকে কি এমন হেলা তুচ্ছ করতে আছে। কত করেছেন তিনি এই হাসপাতালের জন্য।'

মালঞ্চ বলল, 'ছাই করেছেন। দেবতা, দেবতা না ঘোড়ার ডিম। দেবতা হ'লে কি সাহেবের সামনে অমন ভিজে বেড়ালের মত থাকে। দেবতারা কি সাহেবের ভয়ে বউয়ের আঁচলের তলায় গিয়ে লুকোয়?'

পদ্মা মালঞ্চের সখি আর সহকারিণী। মালঞ্চের সঙ্গে হাসি তামাসার সাহস সেই যা কিছু রাখে। মালঞ্চকে গোপনে ডেকে পদ্মা তার কানে কানে বলল, 'এবার রাগের কারণটা কিন্তু তোর বুঝতে পারছি ভাই।'

মালঞ্চ বলল, 'কি রকম?'

পদ্মা ফিস ফিস ক'রে বলল, 'লুকোলেনই যদি তোর আঁচল ছেড়ে বউয়ের আঁচলের তলায় কেন গেলেন, এই তো তোর দুঃখ? কিন্তু মিথ্যেই তুই রাগ করছিস। লুকোবার মত আঁচল তোর কই, ওই

এ্যাপ্রনের তলায় কি কাউকে ঢেকে রাখা যায় ?'

মালঞ্চ ধমক দিয়ে বলল, 'তোর ওসব বিশ্রী ঠাট্টা সব সময় ভালো লাগে না পদ্মা, আমার অনেক কাজ আছে এখন।'

ঘণ্টাখানেক যেতে না যেতে কথাটা ছোট সহরের পাড়ায় পাড়ায় রটে গেল, সেখান থেকে ছড়াল সহরতলীর গ্রামগুলিতে।

অঞ্চলটার বেশির ভাগই নমঃশূদ্র আর কৈবর্তের বাস। হাসপাতালের জন্য দলে দলে এসে তারা নিজেরা ঝাড় থেকে বাঁশ কেটেছে, খুঁটি পুঁতেছে, শণ দিয়ে চাল ছেয়েছে, মাটি কেটে বেঁধেছে ভিঁত। কাজের জন্য অকালের সময় পয়সা অবশ্যই সকলেই পেয়েছে। কিন্তু পয়সাই কি সব ? সে পয়সা তো দু'চার সের চাল কিনতেই তখন ফুরিয়েছে। পয়সা নয়, তাদের কাজের সাক্ষী হিসাবে স্বয়ং হাসপাতাল দাঁড়িয়ে আছে চিরস্থায়ী হয়ে—তাই তাদের মেহনতের বকশিস, তুচ্ছ মজুরী নয়। ঘরে কারো ছেলে মরেছে, মেয়ে মরেছে, কারো ঘরের বউ এখানে এসে উঠেছে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে, চিকিৎসায় ভালো হয়ে কেউ কেউ আবার ফিরেও এসেছে রোগা মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটিয়ে। এ সেই হাসপাতাল। দূর দেশের লোক বলে সুজনগঞ্জের হাসপাতাল। সুজনগঞ্জ তাদেরই গঞ্জ—এই সব চরহাটি, তেঁতুলতলা, ঝুমুরকান্দির লোকদের।

মাতাব্বররা দেখা করতে এল হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর সঙ্গে।

'যা শুনছি সত্য নাকি ডাক্তারবাবু।'

হয়তো সত্য, কিন্তু তার তো দেরি আছে। আগেই এ সব বিষয় নিয়ে ঝামেলা করছে কেন তারা, সিভিল সার্জনের কানে গেলে ফল হয়তো এতে খারাপই হবে। এ সব কথা এদের জানালেই বা কে ? খোঁজ নিয়ে জানল বিভূতি মালঞ্চই এর মূলে। সেই আড়ি পেতে শুনে এসেছে তাদের স্বামী স্ত্রীর কথা। তারপর গঞ্জে, গাঁয়ে রটিয়ে দিয়েছে সর্বত্র।

এমন কি ভীরু, আর বউয়ের আঁচল ধরা বলে তার বদনাম রটাতেও মালঞ্চ কসুর করেনি। ম্লান একটু হাসল বিভূতি। নিঃশব্দে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে মালঞ্চকে সত্যিই বোধ হয় কিছু বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। এতটা সঙ্গত হয়নি। ধমক দেওয়া উচিত ছিল।

বিকেলের দিকে সিভিল সার্জনকে চা খাওয়ার জন্য সবিনয়ে নিমন্ত্রণ জানাল বিভূতি।

নন্দী সাহেব হাসলেন, বললেন, 'সে কি কথা! আমার মত এমন বেদলী মানুষকে নিয়ে টানাটানি করছেন কেন?'

বিভূতিও হাসল, বলল, 'চা-তো আর বৃহৎ ব্যাপার নয়, এটা দলাদলির বাইরে।'

নন্দী সাহেব অপূর্ব ভঙ্গিতে জোড়া ভ্রূ কুঁচকে হাসলেন, 'তাই কি? না ঘরের মধ্যেই আপনার দলাদলি হয়েছে। মনে হচ্ছে এই নিমন্ত্রণটা যেন সেই অন্য দলের পক্ষ থেকে।' উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠলেন নন্দী সাহেব তারপর হাসি থামিয়ে বললেন, 'আচ্ছা বিভূতিবাবু—'

'বলুন।'

'এই খানিক আগেই না আপনি হরিজন আর নারীজনের representation পাঠিয়েছিলেন।'

বিভূতি বিস্মিত হয়ে বলল, 'সে কি।'

নন্দী সাহেব বললেন, হ্যাঁ, প্রথমে এল গাঁয়ের মাতব্বরেরা, তারা চলে যাবার খানিক বাদে এল আপনার নার্সদের দল। বলে গেল, এ হাসপাতাল তুলে দিলে নাকি তারা সব সর্বস্বান্ত হয়ে পড়বে। সুতরাং এমন নিষ্ঠুর অধর্ম যেন আমি কোন ক্রমেই না করি। আমি কি বিশ্বাস করব যে, এসবের কিছু আপনি জানেন না,—আপনি এতক্ষণ ধরে নিতান্তই কেবল স্ত্রীকে চায়ের আয়োজনে সাহায্য করছিলেন।'

বিভূতি স্তম্ভিত হয়ে গেল। আর হাত থেকে যেন এরই মধ্যে কর্তৃত্ব খসে পড়েছে। তাকে না জানিয়ে, তার পরামর্শ না নিয়ে সুরু হয়েছে কাজ, তাকে ডিঙিয়ে তার বিরুদ্ধে মালঞ্চ নার্সদের দলবদ্ধ করেছে জুটিয়েছে আর সবাইকে। মালঞ্চকে সত্যিই এতখানি বাড়তে দেওয়া ঠিক হয়নি।

নন্দী সাহেব বললেন, 'তাই বলি আপনি এত গম্ভীর হয়ে গেলেন কেন বিভূতিবাবু। চায়ের নিমন্ত্রণ আমি সানন্দে গ্রহণ করছি। সত্যিই তো চায়ের কাপে ঝড় তোলা কেন।'

এক ফাঁকে বিভূতি ডেকে পাঠাল মালঞ্চকে। বলল, 'এসব কি হচ্ছে?'

মালঞ্চ নিতান্ত নিরীহ ভঙ্গিতে বলল, 'কিসের কথা বলছেন ডাক্তারবাবু।'

বিভূতি কঠিন স্বরে বলল, 'কিসের কথা বলছি তা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে এত বাড় হয়েছে তোমার।'

প্রশ্রয়! মনে মনে হাসল মালঞ্চ। কাউকে প্রশ্রয় দেওয়ার মত সাহস কি ডাক্তারবাবুর আছে? তবু সবাই তাঁর কাছ থেকে এক ধরনের প্রশ্রয় পায়। তিনি দেন বলে নয়, তিনি না দিয়ে পারেন না বলে। কিন্তু তেমন প্রশ্রয় তো মালঞ্চ তাঁর কাছে চায়নি।

বিভূতি বলল, 'চুপ করে রইলে কেন। জবাব দাও আমার কথার।'

মালঞ্চ বলল, 'আমরা হাসপাতালটি রাখতে চাই।'

'আর আমি চাই না?'

'আমাদের মত অত জোরে বোধ হয় না।'

বিভূতি তীক্ষ্ণ একটু হাসল, 'তাই নাকি? আচ্ছা বেশ, তোমার জোরের নমুনাটা একবার দেখবার অপেক্ষায় রইলাম।'

জোরের নমুনা! মাতব্বররা বলে গেছে এর পর তারা মিটিং করে

দরখাস্ত পাঠাবে জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে। কিন্তু দরখাস্তে বিশ্বাস নেই জজ ম্যাজিষ্ট্রেটকেও নয়। রাত যত বাড়তে লাগল ততই আরেক রকমের জোরের কথা তার মনে পড়তে লাগল। বেছে বেছে আরও দশ পনের জন নার্সকে নিয়ে সে বিকেল বেলায় গিয়েছিল সিভিল সার্জনের লঞ্চে। তাঁকে দুঃখের কথা জানাতে, তিনি কোন কথা শুনতে চাননি, বারবার বিরক্তি প্রকাশ ক'রে অসন্তুষ্টি জানিয়েছিলেন। হতাশ হয়ে সবাই যখন ফিরে এসেছে, তক্তা বেয়ে নেমেছে এসে পথে, তখন হঠাৎ তিনি মালঞ্চকে ফের ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

'রাগ করলে নাকি মালঞ্চ?'

এ যেন সেই প্রবল পরাক্রান্ত সাহেবী পোষাকের সিভিল সার্জন নয়, এ যেন আর কারো গলা নরম আর মিষ্টি। মালঞ্চ সহসা কানকে বিশ্বাস করতে পারেনি। সভয়ে তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছে। সোনার, চশমার ভিতর থেকে ঘোলাটে রঙের যে দুটি চোখ তাকে চেয়ে চেয়ে দেখলে খানিক আগে সেই চোখই কি শাসনে রাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। মালঞ্চ নিজের চোখকে বিশ্বাস করেনি।

তাকে নিরুত্তর দেখে সিভিল সার্জন আবার একটু হেসেছেন, 'রাগ করলে কি করব বলো। দল শুদ্ধ সবাই মিলে অমন ভিড় করে এলে কিছু শোনা যায়, না কিছু বলা যায়?'

সাহস সঞ্চয় ক'রে এবার মালঞ্চ জবাব দিয়েছে, 'তাহলে আমি বিদায় দিয়ে আসি ওদের, আমার একার মুখেই শুনুন সব।'

নন্দী সাহেব মুখ টিপে হেসেছেন 'শুনবই তো, এত ব্যস্ত কেন। শুধু বলবার জন্য উৎসুক কেউ থাকলেইতো হবে না, শুনবার জন্য উপযুক্ত সময়ও তো চাই। বাইরের গণ্ডগোলে তোমার কথা যাতে ভুল না শুনি তাওতো দেখতে হবে।'

মালঞ্চ জিজ্ঞাসা করছিল, 'তাহলে কখন আসব।'

নন্দীসাহেব বলেছিলেন, 'তাও কি আমাকে বলে দিতে হবে? যখন তোমার সুবিধা হয়; তোমার রোগীরা যখন শান্ত হয়ে ঘুমায়, নীরোগ যারা, তারাও মিছিমিছি ছটফট ছুটোছুটি করে না, তেমনি একটা সময়ই সবচেয়ে ভালো।'

মালঞ্চ বলেছিল, 'আচ্ছা আসব। কিন্তু কথা দিন আপনি আমাদের অনুরোধ রাখবেন।'

'রাখব বইকি, কিন্তু সেটা নির্ভর করবে সম্পূর্ণ তোমার ওপর— একথাও মনে রেখ।'

মনে রাখবে বইকি মালঞ্চ। যেমন ক'রেই হোক, যে মুল্যেই হোক সে-ই একমাত্র রক্ষা ক'রেছে এই হাসপাতালকে, আর কারো তা সাধ্যে কুলোয়নি, একথা আর সবাই একদিন ভুলবে, কিন্তু মালঞ্চ মনে ক'রে রাখবে বইকি।

নিজের ঘরে আজ খানিক আগেই গিয়ে ঢুকলো মালঞ্চ। বলল, শরীর ভালো নেই। তারপর বাক্স খুলে মেঝের ওপর ছড়িয়ে ফেলল নানাজনের নানা গোপন উপহার। শাড়ি, সাবান, গন্ধতেল, আংটি আর হার এতদিন কাউকে সে কোন সাড়া দেয়নি। ছুঁয়ে দেখেনি কোন জিনিষ। তবু সেগুলি বাক্সে জমে উঠেছে। ভেবেছে সময়মত ভিখারীদের বিলিয়ে দেবে, না হয় পুড়িয়ে ফেলবে আগুনে, কিংবা তেমন দিন যদি আসে ডেকে দেখাবে একজনকে। একবার দেখবে তিনি কোন্ দৃষ্টিতে দেখেন এসব।

কিন্তু সে আশা আর নেই। কোনদিন কোন উপহার জোটেনি তাঁর কাছ থেকে মালঞ্চের, আজ পেয়েছে চরম উপহার—বিদ্রূপ আর পরিহাস ধমক আর চোখ-রাঙানি। আজ তার জোরের নমুনা দেখতে চেয়েছেন

ডাক্তারবাবু। রাত যখন আরও বাড়ল, বড় একটা সাদা চাদরে নিজেকে ঢেকে নিল মালঞ্চ। তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল বাইরের অন্ধকারের মধ্যে।

ঘণ্টাকয়েক বাদে ফেরার পথে হাসপাতালের কম্পাউণ্ডের সামনে দেখা হোল বিভূতির সঙ্গে। হারিকেনটা উঁচু ক'রে ধরে বিভূতি বলল, 'এই যে মালঞ্চ, এতক্ষণ ধরে তোমাকেই খুঁজছিলাম; কিন্তু মালঞ্চের দিকে তাকিয়ে বিভূতি তারপর আর কোন কথা খুঁজে পেল না। মালঞ্চের মনে পড়ল গায়ের চাদরটা ভুলে লঞ্চেই ফেলে এসেছে।

মিনিটখানেক মালঞ্চও চুপ করে রইল তারপর একটু বাঁকা হাসি হেসে বলল, 'ভাগ্য ভালো। যা হোক এতক্ষণ ধ'রে যাকে খুঁজছিলেন, এতক্ষণ পরে তো শেষ পর্যন্ত তাকেই পেলেন।'

উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত বিভূতি হঠাৎ মালঞ্চের হাত চেপে ধরল, বলল, 'তাকেই পেলাম মানে? সত্যি ক'রে বলো মালঞ্চ কম্পাউণ্ড ছেড়ে কোথায় তুমি ছিলে এতক্ষণ; কোথায় গিয়েছিলে।'

মালঞ্চ বলল 'সে কথা শুনে দরকার নেই আপনার, হাত ছাড়ুন।'

'হাত ছাড়ব! আগে জবাব দাও আমার কথার।'

মালঞ্চ বলল, 'হাত ধরে জবাব আদায় করবার সাহস আপনার কতক্ষণ ধ'রে হ'ল ডাক্তারবাবু। নিশ্চয়ই ভেবেছেন, এতক্ষণ একজন যখন ধ'রে রেখেছিল তখন আপনারও আর ধরতে বাধা নেই কেমন? কিন্তু আমারই না হয় জাত গেছে, নিজের জাতের ভয় তো আছে আপনার।'

অপ্রতিভ বিভূতি মালঞ্চের হাতখানা আস্তে আস্তে ছেড়ে দিল। তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'ঘরে যাও মালঞ্চ, পোষাকটা বদলে এসো। সেই ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ার কেসটি হঠাৎ ভারি খারাপ হয়ে পড়েছে। দুজনেরই সেখানে থাকা দরকার।' এর পর

'শান্ত ম্লান একটু হাসি বিভূতির ঠোঁটের ওপর দেখা দেল। বিভূতি বলল একটা কথার জবাব তোমাকে দেওয়া হয়নি মালঞ্চ। নিজের জন্ম ভয়, আমার কোনদিন ছিল না, ভয় ছিল তোমার জন্যই। এবার তা ভাঙল। কিন্তু তোমাকে ছুঁয়ে জাত আজ আমার যায়নি, কোনদিন যাবেও না।'

মালঞ্চের চোখ দুটি যেন এতক্ষণ পরে ছল ছল করে উঠল।

বিভূতি সেদিকে তাকিয়ে আবার বলল, 'যাও, তৈরী হয়ে এসো।'

রাত আর বেশি নেই। কুকুরের গলার অদ্ভুত শব্দ করতে করতে ছেড়ে যাচ্ছে সিভিল সার্জনের লঞ্চ।

ভোরে আর সময় মিলবে না বলে সুজনগঞ্জের অধিবাসীরা বিদায় অভিনন্দনটা তাঁকে রাত্রেই জানিয়ে রেখেছে।